কিতাবুত তাওহীদ

ড. সালিহ্ ইবনে ফাওযান আল-ফাওযান

كتاب التوحيد

কিতাবুত তাওহীদ

تأليف الشيخ الدكتور العلامة/صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

লেখক: শাইখ ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

অনুবাদ: শাইখ মুখলিসুর রহমান মানসুর

সম্পাদনা: শাইখ মুহাম্মাদ এজাজুল হক

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

প্রধান অফিস
কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।
মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)
www.maktabatussunnah.org
maktabatussunnah19@gmail.com

শাখা অফিস
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।
মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১৯ ঈসায়ী
দ্বিতীয় প্রকাশ: জুন ২০২৩ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্য: ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা

সূচিপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবারবর্গ এবং সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে যে বিশ্বাস রাখা ফরয

চতুর্থ অধ্যায় :

বিদআত পরিচিতি

গ্রন্থকারের ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবার এবং সকল সাথীগণের ওপর।

অতঃপর এটি তাওহীদ বিষয়ক একটি কিতাব। এটি লিখার সময় আমি সংক্ষিপ্ততা ও সরলতার প্রতি খেয়াল রেখেছি। আমাদের বিজ্ঞ আলিমগণের বিভিন্ন মূল কিতাবাদি থেকে তা চয়ন করেছি।

বিশেষত শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ, আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম, শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব রহিমাহুমুল্লাহ এবং তার দাওয়াতের বরকতে গড়ে উঠা বিজ্ঞ ছাত্রদের কিতাবাদি থেকে এ কিতাবটি রচনা করেছি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামী আকীদার জ্ঞান এমন মূল বিদ্যা যার শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ ও তদনুযায়ী আমল করার প্রতি ব্যাপক গুরুত্ব দেয়া জরুরী, যাতে আমলসমূহ সঠিক, আল্লাহর নিকট গৃহিত এবং আমলকারীর জন্য উপকারী হয়।

আকীদার বিষয়টি বর্তমানে বেশি গুরুত্ব সহকারে পড়া ও তদনুযায়ী আমল করা দরকার। কারণ, আমরা এমন এক সময়ে অবস্থান করছি যখন বিপথগামী স্রোতের ধারা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন- নাস্তিকতা, সুফী ও বৈরাগ্যবাদ, কবর পূজা এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশিত হিদায়াত বিরোধী বিদআত ইত্যাদী।

মুসলিম কুরআন-সুন্নাহ ও সালফে সালেহীনের সঠিক পথের ওপর নির্ভরশীল বিশুদ্ধ আকীদার অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দৃঢ়পদ না হলে ঐ সকল ভ্রষ্টতার স্রোতে পতিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এটাই মুসলিম সন্তানদেরকে মূল উৎস হতে বিশুদ্ধ আকীদা শিক্ষা দেয়ার গুরুত্ব বহন করছে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের নাবী মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবার এবং সকল সাথীবর্গের ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষন করুন। আমীন।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ: মানব জীবনে বিপর্যয়-ভ্রষ্টতা

আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টিজীবকে কেবলমাত্র তার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আর এ ইবাদতের জন্য রিযিকসহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস মানুষের জন্য প্রস্তুত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦ مَآ أُرِيدُ مِنۡهُم مِّن رِّزۡقٖ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطۡعِمُونِ ٥٧ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلۡقُوَّةِ ٱلۡمَتِينُ ٥٨﴾

আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। আল্লাহ তা'আলাই তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত। *সূরা আয্ যারিয়াত ৫১:৫৬-৫৮।*

মানুষের আত্মাকে তার নিজ গতিতে ছেড়ে দিলে তা আল্লাহর দাসত্বকে নির্দ্বিধায় স্বীকার করত তাকেই ভালোবাসবে, তারই ইবাদত করবে এবং তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। কিন্তু মানুষ ও জিন শয়তানেরা নিজেদের চাক-চিক্যময় ও ধোকার বাণী দ্বারা আত্মাসমূহকে নষ্ট এবং পথভ্রষ্ট করে। স্বভাবগতভাবে মানুষের হৃদয়ে তাওহীদ সুপ্রতিষ্ঠিত। আর শিরক বহিরাগত নতুন বিষয় যা তাওহীদের ওপর সংযোজন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَأَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفٗاۚ فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ﴾

তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার ওপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। *সূরা আর্ রূম ৩০:৩০।*

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

প্রত্যেক নবজাতক স্বভাবজাত ধর্ম তথা তাওহীদের ওপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহূদী বা খ্রিষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়।[১]

এতে বুঝা যায় আদম সন্তানের মূল হলো তাওহীদ এবং দীন ইসলাম। আদম আলাইহিস সালাম এবং তার পরে অনেক যুগ পর্যন্ত তার সন্তান-সন্ততিরা এর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾

সকল মানুষ একই জাতি সত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকরী হিসাবে। *সূরা আল বাকারা ২:২১৩।*

নূহ (আলাইহিস সালাম) এর জাতিতে সর্ব প্রথম শিরক এবং সঠিক আকীদা হতে বিচ্যুতি সংঘটিত হয়েছে। শিরকে লিপ্ত হওয়ার পর নূহ আলাইহিস সালাম হলেন তাদের প্রতি প্রেরিত প্রথম রসূল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ﴾

আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়ে ছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রসূলের প্রতি যারা তার পরে প্রেরিত হয়েছেন। *সূরা আন্ নিসা ৪:১৬৩।*

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেনঃ আদম এবং নূহ্ আলাইহিস সালাম এর মাঝে দশ যুগের (এক হাজার বছরের) ব্যাবধান ছিল, এ সময়ের সকল মানুষেরা তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ (ইবনে আব্বাসের উপরোক্ত কথা নির্ভেজাল সত্য। কারণ, সূরা আল বাকারাতে উবাই ইবনে কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কিরাতে এসেছেঃ মানুষেরা মতভেদে লিপ্ত হয়ে শিরক করতে শুরু করলে আল্লাহ তা'আলা তাদের মাঝে নাবী ও রসূল প্রেরণ করেন)।[২] এ কিরাতের সমর্থনে প্রমাণ পাওয়া যায় সূরা ইউনুসে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীতেঃ

﴿وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّآ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَٱخۡتَلَفُواْۚ﴾

[১] সহীহ বুখারী ১৩৮৫, সহীহ ইবনে হিব্বান ১২৯।

[২] ইগাসাতুল্ লাহ্‌ফান ২/১০২।

আর সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল, পরে পৃথক হয়ে গেছে। *সূরা ইউনুস ১০:১৯।*

এর মাধ্যমে ইবনে কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বুঝাতে চেয়েছেন: নাবী ও রসূল প্রেরণের কারণ হলো, সঠিক দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার পরে সে বিষয়ে মানুষদের মতভেদে লিপ্ত হওয়া। যেমন: অনেক যুগ ধরে আরবরা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর দীনের ওপর ছিল। পরিশেষে আম্‌র ইবনে লুহাই আল্‌ খুযায়ী এসে দীনে ইবরাহীমকে পরিবর্তন করত আরব ভূখণ্ডে মূর্তির আবির্ভাব ঘটায়। বিশেষত হেজায তথা মক্কা-মদীনায়।

তখন থেকে আবারও গাইরুল্লাহর ইবাদত বা পূজা করা শুরু হয়ে যায়। ফলে এ সকল পবিত্র ভূমি ও পার্শ্ববর্তী এলাকা শিরকে ছেয়ে যায়। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তার শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রেরণ করলে তিনি মানুষদেরকে তাওহীদ ও ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর দীনের প্রতি আহ্বান করেন। আল্লাহর একত্বের বিশ্বাস ও দীনে ইবরাহীম পুনরায় ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি আল্লাহর রাস্তায় যথাযথ জিহাদ পরিচালনা করেন। তিনি মূর্তিসমূহ ভেঙ্গে ফেলেন, আল্লাহ তার মাধ্যমে দীন ইসলাম পূর্ণ করত তার দ্বারাই বিশ্ববাসির ওপর তার নিয়ামত পরিপূর্ণ করেন।

এ উম্মাতের শুরুর দিকের মর্যাদাপূর্ণ যুগের লোকেরা তার দেখানো পথে চলেন। পরবর্তী সময়ে অজ্ঞতা-মূর্খতা প্রসার লাভ করত নির্ভেজাল ইসলাম ধর্মে ভিন্ন ধর্মের অনেক ভেজাল প্রবেশ করে। অনেক পথভ্রষ্ট দাঈদের কারণে উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার মাঝে আবারো নতুন করে বহু শিরকের প্রচলন শুরু হয়। এ উম্মাতের শিরকে পতিত হওয়ার আরো অনেক কারণ রয়েছে। যেমন: ওলী-আওলিয়া ও সৎ ব্যক্তিদের সম্মানের পথ ধরে কবর পাকা করণ ও তার ওপর গম্বুজ নির্মাণ করা, তাদের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা, এমনকি তাদের কবরের ওপর মাযার-গম্বুজ ইত্যাদি তৈরী করত এগুলোকে প্রতিমা (মূর্তি) হিসাবে গ্রহণ করে তার ইবাদত করা শুরু হয়।

তাদের নিকটে প্রার্থনা, ফরিয়াদ বা বিপদ হতে মুক্তি কামনা, তাদের জন্য যবেহ্ ও নযর মানত করাসহ আরো অনেক শিরকের সূত্রপাত ঘটে। যারা এসব করে তারা এ শিরকগুলোকে সৎ ব্যক্তিদের দ্বারা ওসীলা করা এবং তাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ বলে নাম দেয়। তাদের ধারণা অনুযায়ী এটা মৃত ব্যক্তিদের ইবাদত নয়। অথচ তারা বেমালুম ভুলে গেছে, এটাই ছিল পূর্বের মুশরিকদের উক্তি। তারা বলত,

{مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى}

আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। *সূরা আয্ যুমার ৩৯:৩।*

প্রাক ও বর্তমান যুগে মানুষদের মাঝে এ সকল শিরক পতিত হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ তাওহীদে রুবূবীয়্যাহ্ তথা আল্লাহর প্রভুত্বে বিশ্বাস করে। তবে তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক বা অংশিদার সাব্যস্ত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ﴾

অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর ওপর ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক। *সূরা ইউসুফ ১২:১০৬।*

অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি ব্যতীত কেউ আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করেনি। যেমন: ফেরআ'উন, দাহ্‌রী নাস্তিকরা (এরা বিশ্বাস করে যে, সময়ের আবর্তেই তারা আসে যায়), বর্তমান যুগের সাম্যবাদী কমিউনিস্টরা। তবে এরা অহংকারবশত আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। অন্যথায় অভ্যন্তরীণ ও আত্মিকভাবে তারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে বাধ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾

তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলিকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। *সূরা আন্ নামল ২৭:১৪।*

কিন্তু বিবেক স্বীকার করে যে, প্রত্যেক সৃষ্টির একজন স্রষ্টা আবশ্যক। প্রত্যেক অস্তিত্বমান বস্তুর একজন অস্তিত্বদাতা আবশ্যক। আর সূক্ষ ও নিয়মতান্ত্রিক নীতির ওপর পরিচালিত এ পৃথিবীর অবশ্যই একজন বিজ্ঞ ব্যবস্থাপক রয়েছেন। যিনি সব কিছু করতে সক্ষম ও সর্বজ্ঞ। যে ব্যক্তি এ সর্বজ্ঞ স্রষ্টাকে অস্বীকার করে সে হয় জ্ঞান শূন্য অথবা এমন অহংকারী যে, তার জ্ঞান হারিয়ে নিজেকে নির্বোধে পরিণত করেছে। আর এরূপ লোকদের কথার কোনো গুরুত্ব নেই এবং তারা গণনারও অযোগ্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ শিরকের সংজ্ঞা ও তার প্রকারভেদ

ক। শিরকের সংজ্ঞাঃ আল্লাহর প্রভুত্ব এবং ইবাদতে অংশিদার সাব্যস্ত করাকে শিরক বলে। ইবাদতের ক্ষেত্রেই অধিকাংশ শিরক হয়ে থাকে। যেমনঃ আল্লাহর সাথে অন্যকে আহ্বান করা বা তার জন্য ইবাদতের কোনো অংশকে নির্দিষ্ট করা। যেমনঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য জবাই করা, নযর-মানত, ভয়, আশা-আকঙ্খা, ভালোবাসা। নিম্নোক্ত কারণে শিরক সবচেয়ে বড় যুলুমঃ

১। এতে মাবূদের গুণের ক্ষেত্রে স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে সাদৃশ্য করা হয়ঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে সে তাকে আল্লাহর সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করে। আর এটাই সবচেয়ে বড় যুলুম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ﴾

নিশ্চয় শিরক হলো মহা বা বড় যুলুম। *সূরা লুকমান ৩১:১৩।*

যুলুমের সংজ্ঞাঃ কোনো বস্তুকে তার অপাত্রে স্থাপন করা, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে সে ইবাদতকে তার অপাত্রে স্থাপন করত অযোগ্যের জন্য তা সম্পাদন করে। আর এটাই হলো সর্বাপেক্ষা বড় যুলুম বা অত্যাচার।

২। আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি শিরক করার পর তাওবা না করে মারা যাবে তিনি তাকে কোনো ক্রমেই ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ.

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তার সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য ইচ্ছা করেন। *সূরা আন্ নিসা ৪:৪৮।*

৩। আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি মুশরিকের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন, সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই। *সূরা আল্ মায়িদা ৫:৭২।*

৪। **শিরক সকল আমল ধ্বংস করে দেয়**। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوۡ أَشۡرَكُواْ لَحَبِطَ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴾

যদি তারা শিরক করত, তবে তাদের কাজ কর্ম তাদের জন্যে ব্যর্থ হয়ে যেত। *সূরা আল্ আন আম ৬:৮৮।* অপর আয়াতে তিনি বলেন,

﴿وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ﴾

আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন। *সূরা আয্ যুমার ৩৯:৬৫।*

৫। **মুশরিকের জান ও মাল হালাল**। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ﴾

অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। *সূরা আত্ তাওবা ৯:৫।*

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا.

মানুষেরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মাবূদ নেই) না বলা পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি। যখন তারা এ কালিমা পাঠ করবে তখন তাদের জান ও মালকে ইসলামের অধিকার ব্যতীত আমার নিকট হতে নিরাপদ করে নিল।[৩]

[৩] সহীহ মুসলিম হা/২১, ইবনে মাজাহ হা/৩৯২৮, তিরমিযী হা/২৬০৬।

৬। শিরক সবচেয়ে বড় কাবীরা গুনাহ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ.

আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে সংবাদ দিব না? সাহাবায়ে কিরাম বললেন: হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বললেন: সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।[8]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন: আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, মাখলূক সৃষ্টি এবং বিভিন্ন নির্দেশ দেয়ার উদ্দেশ্য হলো: আল্লাহর নাম ও গুণাবলিসহকারে মানুষেরা যেন তাকে চিনে, একমাত্র তারই যেন ইবাদত করা হয় এবং তার সাথে শরীক বা অংশিদার সাব্যস্ত করা না হয়। মানুষ যেন ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর এটা সেই ইনসাফ যার দ্বারা আসমান ও যমীন স্থাপিত। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ﴾

আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। *সূরা হাদীদ ৫৭:২৫।*

অতএব, আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদ দিয়েছেন যে, মানুষকে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যই তিনি তার রসূলগণ এবং আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন। আর এটাই হলো আদ্‌ল বা ইনসাফ। আর সবচেয়ে বড় ন্যায় বা ইনসাফ হলো: তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ব। এটা আদ্‌ল বা ইনসাফের মূল এবং তার খুঁটি। আর শিরক হলো যুলুম বা অত্যাচার।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

নিশ্চয় শিরক হলো মহা (বড়) যুলুম। *সূরা লুকমান ৩১:১৩।*

---

[8] সহীহ বুখারী হা/৫৯৭৬।

সুতরাং শির্ক হলো সবচেয়ে বড় যুলুম। তাওহীদ হলো সবচেয়ে বড় আদ্ল বা ইনসাফ। অতএব, যা কিছু এটার বিরোধী হবে তা সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

এমনকি আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন: শিরক যখন তার মূলেই দুনিয়া সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্যের বিরোধী তখন স্বভাবতই তা সাধারণভাবে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ। প্রত্যেক মুশরিকের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তাওহীদপন্থিদের জন্য তার জান ও মাল হালাল করেছেন। যখন মুশরিকরা আল্লাহর দাসত্বকে অস্বীকার করেছে তখন মুসলমানদের জন্য তাদেরকে দাস হিসাবে গ্রহণের হুকুম দেয়া হয়েছে। মুশরিকের কোনো আমল আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করবেন না। তার ব্যাপারে কোনো শাফা'আত গ্রহণ করা হবে না। পরকালে তার কোনো আহ্বানে সাড়া দেয়া হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোনো আশা কবুল করবেন না। কারণ, মুশরিক আল্লাহ সম্পর্কে সর্বাধিক জাহিল বা অজ্ঞ। ফলে সে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্য থেকেই তার শরীক স্থাপন করেছে। আর এটা তার সম্পর্কে সর্বোচ্চ পর্যায়ের অজ্ঞতা। আর মুশরিকের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ যুলুম বা অত্যাচার। তবে প্রকৃত পক্ষে মুশরিক আল্লাহর উপরে নয় বরং নিজেই নিজের ওপর যুলুম করে।[৫]

৭। শিরক হলো অপূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত বিষয়: আর আল্লাহ তা'আলা এ দু'টি থেকেই নিজেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে সে আল্লাহর জন্যই তাই সাব্যস্ত করলো যা থেকে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন। আর এটা আল্লাহর সাথে চরম বিরোধীতা, শত্রুতা এবং অবাধ্যতা।

খ। শিরকের প্রকারভেদ: শিরক দু'প্রকার।

প্রথম প্রকার: শিরকে আকবার বা বড় শিরক- যা মানুষকে দীন ইসলাম থেকে বের করে তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী করে দেয়, যদি সে তাওবা না করে শিরকের ওপর মারা যায়।

আর শিরকে আকবার হলো- ইবাদতের কোনো অংশকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য করা। যেমন: আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকটে প্রার্থনা করা, পশু জবাই এবং নযর-মানতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির বদলে কবর, জিন এবং শয়তানের নৈকট্য অর্জন করা। মৃত ব্যক্তি বা জিন-শয়তানের ক্ষেত্রে এ ভয় করা যে তারা ক্ষতি করতে বা অসুখে পতিত করতে পারে। আল্লাহকে বাদ

[৫] আল্ জাওয়াবুল কাফী ১০৯ পৃষ্ঠা।

দিয়ে এমন কারো নিকটে প্রয়োজন পূরণের এবং বিপদাপদ দূরের আশা রাখা যা তারা আদৌ করতে সক্ষম নয়। অথচ বিভিন্ন ওলী ও সৎব্যক্তিদের কবরকে মাযার ও গম্বুজ বানিয়ে নামধারী মুসলমানেরা এ কর্ম অহরহ করে চলেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ قُلۡ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعۡلَمُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ﴾

আর তারা উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা না তাদের কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারে, না লাভ। তারা বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের মাঝে? তিনি পুতঃপবিত্র ও মহান সে সমস্ত বিষয় থেকে যাকে তোমরা শরীক করছ। *সূরা ইউনুস ১০:১৮।*

দ্বিতীয় প্রকার শিরক: শিরকে আসগার বা ছোট শিরক- যা কোনো মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। তবে তা তাওহীদকে ক্রটিযুক্ত করে। আর এটা ব্যক্তিকে ক্রমান্বয়ে শিরকে আকবারে পতিত করে।

শিরকে আসগার বা ছোট শিরক দু'প্রকার:

ক। প্রথম প্রকার: জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের দ্বারা শিরক করা। কথা ও কাজের মাধ্যমে এ শিরক হতে পারে।

কথার মাধ্যমে শিরকের উদাহরণ হলো: আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম/শপথ করে সে কুফরী বা শিরক করে।[৬]

ما شاء الله وشئت 'আল্লাহ এবং তুমি যেমন চেয়েছ'- এমন কথা বলাও শিরক। কোনো এক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এরূপ কথা

---

[৬] সহীহ: সুনানে তিরমিযী ১৫৩৫।

বললে, তিনি তাকে বললেন: তুমি আমাকে আল্লাহর সাথে শরীক (অংশিদার) করে দিলে? বরং বল, ما شاءَ الله وحده আল্লাহ একাই যা চান।[৭]

এমন কথা বলাও শিরক যে, لولا الله وفلان আল্লাহ এবং অমুক ব্যক্তি যদি না থাকতেন বা না হতেন (তাহলে আমার বড় ক্ষতি হয়ে যেত)। বরং বলা উচিত:

ما شاءَ الله ثُمَّ شاء فلان؛ ولولا الله ثمَّ فلان

আল্লাহ যা চান অতঃপর অমুকে যা চান। আল্লাহ অতঃপর অমুক ব্যক্তি যদি না হতেন। কারণ, আরবীতে ছুম্মা (অতঃপর) শব্দটি ধারাবাহিকতা ও সময়ের ব্যবধান অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বান্দার চাওয়া আল্লাহর চাওয়ার আওতাভুক্ত হবে, তবে পর্যায়ক্রমে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না। *সূরা আত্ তাকভীর ৮১:২৯।*

অপর দিকে আরবি الواو ওয়াও অর্থ ও বা এবং : সাধারণ একত্রিকরণ এবং শরীকানার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যা ধারাবাহিকতা বা দূরত্ব বুঝায় না। অনুরূপ আরো উক্তি হলো: "মা লি ইল্লাল্লাহু ওয়া-আনতা ما لي إلا الله وأنت (আমার জন্য তো আল্লাহ ও তুমি আছো), হাযা মিন বারাকাতিল্লাহি ওয়া-বারাকাতিকা هذا من بركات الله وبركاتك (এ তো আল্লাহ ও তোমার বরকতে হয়েছে)।

কাজের মাধ্যমে যে সকল ছোট শিরক হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ: বালা-মুসীবত দূর বা প্রতিহত করার জন্য রিং বা তাগা বাঁধা, বদ নযর বা অন্য কোনো ভয়ে তাবীজ কবচ লটকানো, যদি এরূপ বিশ্বাস করে যে, এগুলো রোগ মুক্তি, বালা-মুসীবত দূর অথবা প্রতিহত করার কারণ তবে তা শিরকে আসগার বা ছোট শিরক। কারণ, আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে বালা-মুসীবত দূরের কারণ করেননি। অপরদিকে কেউ যদি এমন বিশ্বাস করে স্বয়ং এগুলোই বালা-মুসীবত বা রোগ দূর করে তবে তা শিরকে আকবার বা বড় শিরক বলে গণ্য হবে। কারণ, সে নিজেকে আল্লাহ ব্যতীত এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত করেছে।

---

[৭] সহীহ: সুনানে নাসায়ী আল্ কুবরা ১০৭৫৯।

খ। দ্বিতীয় প্রকার শিরকে আসগার: শিরকে খফী বা গোপন শিরক। যা ইচ্ছা ও নিয়্যাতের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন: লোক দেখানো বা শুনানোর জন্য কোনো কাজ করা। যেমন: আল্লাহর নৈকট্য লাভের কোনো কাজ করে মানুষের প্রশংসা চাওয়া। যেমন, কেউ সুন্দরভাবে সালাত আদায় করে বা দান-সাদাকা করে যাতে মানুষ তার প্রশংসা করে।

অথবা অন্য মানুষকে শুনিয়ে বিভিন্ন যিকিরের শব্দ বলে বা তিলাওয়াতে তার সূর তথা কণ্ঠ সুন্দর করে যাতে মানুষেরা তা শুনে তার প্রশংসা করে। আমলে রিয়া (লোক দেখানো বা শুনানো) প্রবেশ করলে ঐ আমল বাতিল হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا﴾

যারা তাদের পালনকর্তার সাথে (কিয়ামতের দিন) সাক্ষাত করতে চায় তারা যেন সৎকর্ম করে এবং তাদের পালনকর্তার ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে। *সূরা আল্ কাহফ ১৮:১১০।*

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ.

আমি তোমাদের উপরে শিরকে আসগারের সবচেয়ে বেশি ভয় করি। সাহাবাগণ বললেন: হে আল্লাহর রসূল শিরকে আসগার কি? তিনি বললেন: রিয়া বা লোক দেখানো আমল করা।[৮]

শিরকে খফীর অন্তর্ভুক্ত হলো: পার্থিব লোভে কোনো আমল করা। যেমন, সম্পদের জন্য কেউ হাজ্জ করে বা ইমামতি করে বা দীনি ইলম শিক্ষা করে অথবা জিহাদ করে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ

ধ্বংস হোক দিনার-দিরহামের দাস বা বান্দা। ধ্বংস হোক মখমল ও খামীসার (এক প্রকার চাদর) দাস, যদি সে কিছু পায় তবে খুশি হয়, অন্যথায় অসন্তুষ্ট হয়।[৯]

---

[৮] হাসান: মুসনাদে আহমাদ ২৩৬৩০।

[৯] সহীহ বুখারী হা/২৮৮৬, ৬৪৩৫; বাগাবী ফি শারহিস সুন্নাহ ৪০৫৯।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন: ইচ্ছা ও নিয়্যাতের ক্ষেত্রের শিরক এমন এক মহাসাগর যার কোনো কুল কিনারা নেই। খুব কম সংখ্যক লোকই এ থেকে বাঁচতে পারে। অতএব, যে ব্যক্তি স্বীয় আমলের মাধ্যমে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সন্তুষ্টি চায় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্য করত তার নিকটে প্রতিদান চাই সে ব্যক্তি নিয়্যাত ও ইচ্ছায় শিরক করে।

ইখলাস হলো: যাবতীয় কথা, কাজ, ইচ্ছা ও নিয়্যাত কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য একনিষ্ঠ করা। এটিই হলো ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর একনিষ্ঠ দীন যার আদেশ আল্লাহ তা'আলা তার সকল বান্দাকে দিয়েছেন। এ ছাড়া অন্য কোনো দীন আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে গ্রহণ করবেন না। এটাই ইসলামের আসল রূপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ﴾

যারা ইসলাম ছাড়া অন্য দীন অনুসন্ধান করবে তা তার পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হবে না। আর সে ব্যক্তি পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। *সূরা আলে ইমরান ৩:৮৫।*

এটাই হল ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর দীন। যে ব্যক্তি তা থেকে বিমুখ হবে সে নিরেট বোকা ও নির্বোধ।[১০]

বড় ও ছোট শিরকের মাঝে পার্থক্যসমূহ

১। বড় শিরক দীন ইসলাম থেকে বের করে দেয়। অপর দিকে শিরকে আসগার দীন থেকে বের করে দেয় না। তবে তাওহীদের কমতি ও ত্রুটি করে।

২। শিরকে আকবারকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী। শিরকে আসগারকারী জাহান্নামে প্রবেশ করলেও সেখানে চিরস্থায়ী হবে না।

৩। শিরকে আকবার যাবতীয় আমল বাতিল করে দেয়। শিরকে আসগার সকল আমল নষ্ট করে না। তবে রিয়া ও দুনিয়ার উদ্দেশ্যে যে কাজ করা হয় শিরকে আসগার কেবল ঐ আমলকেই নষ্ট করে।

৪। শিরকে আকবার জান মাল হালাল করে দেয়। অপর দিকে শিরকে আসগার জান মাল হালাল করে না।

---

[১০] আল্ জাওয়াবুল কাফী ১১৫ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ কুফরীর পরিচয় ও প্রকারভেদ

ক। কুফরীর পরিচয়ঃ কুফরীর শাব্দিক অর্থঃ ঢাকা বা গোপন করা। শরীআতের পরিভাষায় কুফরী হলোঃ ঈমানের বিপরীত বিষয়। কারণ, কুফরী হলোঃ আল্লাহ তা'আলা ও রসূলের প্রতি ঈমান না রাখা। এর সাথে তাদের প্রতি মিথ্যারোপ থাকুক বা না থাকুক তা দেখার বিষয় নয়। বরং আল্লাহ ও রসুলের ক্ষেত্রে সামান্য সন্দেহ, সংশয় বা বিমুখতা বা তাদের প্রতি সামান্য বিদ্বেষ বা অহংকার অথবা এমন প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ করতে বাধা দেয় তাই কুফরী। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ ও রসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করা উপরে উল্লেখিত বিষয়াবলির মাধ্যমে কুফরী করার চেয়েও মারাত্মক ও বড় কুফরী। অনুরূপভাবে কেউ যদি রসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাতু অস্সালাম) সত্যতা জানা সত্ত্বেও হিংসা ও বিদ্বেষবশত তাদেরকে অস্বীকার এবং মিথ্যারোপ করে তবে সেও বড় কুফরীতে লিপ্ত হলো।[১১]

খ। কুফরীর প্রকারসমূহঃ কুফরী দু'প্রকারঃ

১। প্রথম প্রকারঃ কুফরে আকবার (বড় কুফরী) যা মানুষকে দীন (ইসলাম) থেকে বের করে দেয়। বড় কুফরী পাঁচ প্রকারঃ

(১) আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কুরআন হাদীসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে কুফরী করা। এর দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥٓ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَٰفِرِينَ﴾

যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার কি স্মরণ রাখা উচিত নয় যে, জাহান্নামই সেসব কাফিরের আশ্রয় স্থল হবে? *সূরা আল আনকাবূত ২৯: ৬৮।*

(২) সত্য জানা সত্ত্বেও অহংকার ও অস্বীকার করার মাধ্যমে কুফরী করা। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[১১] মাজমূ ফতোওয়া শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) ১২/৩৩৫।

﴿وَإِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبۡلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾

আর যখন আমি আদমকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইব্লীস ব্যতীত সবাই সিজ্দা করলো। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। *সূরা আল্ বাকারা ২: ৩৪।*

(৩) সন্দেহ ও সংশয়বশত কুফরী করা। এটাকে ধারণা প্রসূত কুফরীও বলা হয়। এর দলীলে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفۡسِهِۦ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِۦٓ أَبَدًا ٣٥ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيۡرًا مِّنۡهَا مُنقَلَبًا ٣٦ قَالَ لَهُۥ صَاحِبُهُۥ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَكَفَرۡتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٍ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًا ٣٧ لَّٰكِنَّا۠ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشۡرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدًا﴾

নিজের প্রতি যুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল, আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। যদি কখনও আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে দেয়া হয়, তবে সেখানে এর চাইতে উৎকৃষ্ট পাব। তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসঙ্গে বলল: তুমি তাকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, অতঃপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে? কিন্তু আমি তো একথাই বলি, আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবং আমি কাউকে আমার পালনকর্তার শরীক মানি না। *সূরা আল্ কাহ্ফ ১৮: ৩৫-৩৮।*

(৪) বিমুখতা বা মুখ ফিরিয়ে নেয়ার মাধ্যমে কুফরী করা। এর দলীল আল্লাহর বাণী:

{وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ}

আর কাফিররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। *সূরা আহকাফ ৪৬: ৩।*

(৫) মুনাফিকির মাধ্যমে আল্লাহ ও রসূলের সাথে কুফরী করা।

এর দলীল হলো আল্লাহর বাণী,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَفۡقَهُونَ﴾

এটা এজন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফের হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না। *সূরা মুনাফিকুন ৬৩: ৩।*

২। দ্বিতীয় প্রকার কুফরী হলো: কুফরে আসগার (ছোট কুফরী) যা মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। এটা আমলগত কুফরী। এটা ঐ সকল গুনাহ যেগুলোকে কুরআন-হাদীসে কুফরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে তা বড় কুফরীর সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে না। যেমন আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখিত নিয়ামতের কুফরী বা অস্বীকার করা,

﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا قَرۡيَةٗ كَانَتۡ ءَامِنَةٗ مُّطۡمَئِنَّةٗ يَأۡتِيهَا رِزۡقُهَا رَغَدٗا مِّن كُلِّ مَكَانٖ فَكَفَرَتۡ بِأَنۡعُمِ ٱللَّهِ﴾

আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, তথায় প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। *সূরা আন্ নাহল* **১৬: ১১২**।

মুসলমানের সাথে মুসলমানের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াও এ প্রকার কুফরীর অন্তর্ভুক্ত।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসিকী এবং হত্যা করা কুফরী।[১২]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

আমার পরে তোমরা কুফরীতে লিপ্ত হয়ে একে অপরকে হত্যা করিও না।[১৩]

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করাও এ ধরনের কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[১২] সহীহ বুখারী হা/৪৮, সহীহ মুসলিম হা/৬৪, ইবনে মাজাহ হা/৬৯, তিরমিযী হা/১৯৮৩।

[১৩] সহীহ বুখারী হা/১২১, সহীহ মুসলিম হা/৬৫, ইবনে মাজাহ হা/৩৯৪২।

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ.

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করে সে কুফরী করে বা শিরক করে।[১৪] আল্লাহ তা'আলা কাবীরা গুনাহকারীকে মুমিন বলে উল্লেখ করে বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। *সূরা আল বাকারা ২: ১৭৮।*

আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীকে মুমিনদের তালিকা থেকে বের করে দেননি। বরং তাকে নিহতের অভিভাবকদের ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾

অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালোভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। *সূরা আল বাকারা ২:১৭৮।*

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ ভ্রাতৃত্ব দ্বারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বই উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ﴾

যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। *সূরা আল হুজুরাত ৪৯: ৯।*

পরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ﴾

মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। *সূরা আল হুজুরাত ৪৯: ১০।* শরহে তাহাবিয়া থেকে সংক্ষেপায়িত।

---

[১৪] সহীহ: সুনানে তিরমিযী হা/১৫৩৫।

বড় কুফরী ও ছোট কুফরীর মাঝে মূল পার্থক্য:

১। কুফরে আকবার দীন ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং সকল আমল নষ্ট করে। কুফরে আসগার ইসলাম থেকে বের করে না এবং সকল আমল নষ্টও করে না। তবে পাপ অনুযায়ী ইসলামের ঘাটতি হয় এবং এটা উক্ত পাপীকে শাস্তির মুখোমুখি করবে।

২। কুফরে আকবার এই কুফরকারীকে চিরস্থায়ী জাহান্নামে নিয়ে যাবে। কুফরে আসাগারকারী জাহান্নামে প্রবেশ করলেও তাতে চিরস্থায়ী হবে না। আবার কখনও আল্লাহ তার তাওবা কবুল করলে তাকে জাহান্নামেই প্রবেশ করাবেন না।

৩। কুফরে আকবার জান ও মাল হালাল করে দেয়। (অর্থাৎ কুফরে আকবারকারী কাফির তাই যুদ্ধের সময় তার জান মালে হস্তক্ষেপ করা মুসলমানদের জন্য জায়িয)। কিন্তু কুফরে আসগারে জান-মাল হালাল হয় না।

৪। কুফরে আকবারকারী ব্যক্তির সাথে মুমিনদের শত্রুতা পোষণ করা ওয়াজিব। নিকটাত্মীয় হলেও মুমিনদের জন্য তার সাথে ভালোবাসা, বন্ধুত্ব এবং চলাফেরা করা জায়িয নয়। অপরদিকে কুফরে আসগার ব্যাপকভাবে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসাকে নিষেধ করে না। বরং কুফরে আসগারকারীকে তার ঈমান অনুযায়ী ভালোবাসতে এবং বন্ধুত্ব রাখতে হবে। তার গুনাহ অনুযায়ী তার সাথে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করতে হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: মুনাফিকির পরিচয় ও তার প্রকারভেদ

ক) মুনাফিকির পরিচয়: নিফাক শব্দটি نَافَقَ শব্দের মাসদার বা মূল। বলা হয় نَافَقَ يُنَافِقُ نِفَاقًا وَمُنَافَقَة। নিফাক শব্দটি النافقاء 'না-ফিকা-উন' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। যার অর্থ হলো ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর গর্ত হতে বাহির হওয়ার অনেকগুলো পথের একটি পথ। কারণ যখন তাকে এক বহির্গমন পথ দিয়ে খোঁজা হয় তখন সে অন্য পথ দিয়ে বেরিয়ে যায়। অনেকে বলেছেন: নিফাক শব্দটি আন্ নাফ্কু থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এটা ঐ গর্ত যেখানে সে লুকিয়ে থাকে।[১৫]

---

[১৫] আন্ নিহায়া লি-ইবনিল আসীর ৫/৯৮।

শরীআতের পরিভাষায় নিফাকের সংজ্ঞা: বাহ্যিকভাবে ইসলাম ও কল্যাণ প্রকাশ করা এবং হৃদয়ে কুফরী ও খারাবি লুকিয়ে রাখা। মুনাফিককে মুনাফিক বলে নাম করণের কারণ হলো সে এক দরজা দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করে অন্য দরজা দিয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়।

মুনাফিকি থেকে আল্লাহ তা'আলা তার নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা সতর্ক করেছেন:

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}

নিশ্চয় মুনাফিকরাই হলো ফাসিক। *সূরা আত্ তাওবা ৯:৬৭।*

এখানে ফাসিক বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা শরীআত তথা ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদেরকে কাফেরের চেয়ে খারাপ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন:

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ}

নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা রয়েছে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। *সূরা আন্ নিসা ৪:১৪৫।* আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ}

অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে, আল্লাহ তাদেরকে এ প্রতারণার বদলা (শাস্তি) দিবেন। *সূরা আন্ নিসা ৪:১৪২।* অন্য স্থানে তিনি বলেন,

﴿يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ٩ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ﴾

তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না। তাদের অন্তকরণ ব্যধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুত তাদের মিথ্যাচারের দরুন তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব। *সূরা আল্ বাকারা ২:৯-১০।*

খ) নিফাকির প্রকার: নিফাকি দু'প্রকার। প্রথম প্রকার: আকীদা বা বিশ্বাসগত নিফাক।

এটা বড় নিফাকি, এ প্রকার মুনাফিক বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করে এবং হৃদয়ে কুফরী গোপন রাখে। এ প্রকার নিফাকি মানুষকে ইসলাম থেকে

সম্পূর্ণ বের করে দেয়। এ মুনাফিক জাহান্নামের সর্বনিম্ন ও অতল গহ্বরে অবস্থান করবে। এ প্রকার মুনাফিককে আল্লাহ তা'আলা খারাপির যাবতীয় গুণে গুণান্বিত করেছেন। যেমনঃ কুফরী, বে-ঈমান, দীন ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা, ইসলামের প্রতি শত্রুতা প্রকাশে অংশ গ্রহণের জন্য ইসলামের শত্রুদের সাথে সম্পূর্ণ একাত্বতা ঘোষণা করা ইত্যাদি।

এ প্রকার মুনাফিক সর্বদা পাওয়া যায়। বিশেষত যখন ইসলাম শক্তিশালী থাকে এবং বাহ্যিকভাবে তারা এর প্রতিরোধ করতে পারে না। তখন এসকল মুনাফিকরা ইসলামে প্রবেশের ভান করে। যাতে গোপনে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে এবং নিজেদের জান ও মালের নিরাপত্তা নিয়ে মুসলমানদের সাথে বসবাস করতে পারে। তাই তারা আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ, রসূলগণ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি বাহ্যত ঈমান প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ ভাবে তারা ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, বরং একে তারা মিথ্যা মনে করে। বাস্তবে তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না। তারা এও বিশ্বাস করে না যে, আল্লাহ স্বীয় বাণী একজন মানুষের উপরে নাযিল করে তাকে বিশ্ববাসীর জন্য রসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যাতে আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি মানুষদেরকে হিদায়াত করেন এবং তার শাস্তি ও আযাব হতে তাদেরকে ভয় দেখান ও সতর্ক করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এদের চেহারা ও গোপনীয়তা উম্মুক্ত করেছেন। তাদের সকল বিষয় আল্লাহ মুমিনদের নিকটে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যাতে তারা নিফাকী ও মুনাফিকদের থেকে সদা সজাগ ও সতর্ক থাকেন।

সূরা বাকারার শুরুতে আল্লাহ তা'আলা তিন শ্রেণির লোকের কথা উল্লেখ করেছেনঃ মুমিন, কাফির, মুনাফিক।[১৬]

এতে মুমিনদের ক্ষেত্রে চারটি এবং কাফিরদের ক্ষেত্রে দু'টি আয়াত নাযিল করা হলেও মুনাফিকদের ক্ষেত্রে তেরটি আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, তাদের সংখ্যা অনেক, তাদের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানগণ চরম নির্যাতন, ফিতনা, ভোগান্তি ও কষ্টের শিকার হয়ে থাকেন। তাদের দ্বারা ইসলামের মারাত্মক ক্ষতি হয়। কেননা, তারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয়। নিজেদেরকে ইসলামের ধারক বাহক ও সাহায্যকারী হিসাবে জাহির করে। কিন্তু বাস্তবে তারা এর শত্রু। সুযোগ পেলেই তারা মুর্খদের

---

[১৬] সূরা আল বাকারা ২:১-২০।

নিকটে জ্ঞানী ও কল্যাণকামীর বেশে ইসলামের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করে। কিন্তু বাস্তবে তা চরম পর্যায়ের অজ্ঞতা এবং গোল-যোগ সৃষ্টি ছাড়া কিছুই না।

বড় নিফাকী ছয় প্রকার:

১। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মিথ্যারোপ করা।

২। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার কিছু অংশকে মিথ্যারোপ করা।

৩। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি বিদ্বেষ রাখা।

৪। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার কিছু অংশের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

৫। রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীন নিচু, অপমানিত বা পরাজিত হলে খুশি হওয়া।

৬। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দীন বা ধর্ম বিজয়ী হলে মন খারাপ হওয়া।

দ্বিতীয় প্রকার নিফাকী: নিফাকে আমালী বা কার্যক্ষেত্রে মুনাফিকি।

এটা হলো: মুনাফিকদের কোনো আমল করা। এ প্রকার নিফাকে হৃদয়ে ঈমান বাকী থাকে এবং তা ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। তবে এটা দীন ইসলাম থেকে বের করে দেয়ার ওসীলা বা মাধ্যম। এ প্রকার মুনাফিকের হৃদয়ে ঈমান ও নিফাকি উভয়টি থাকে। নিফাকি যখন বেশি হয় তখন কোনো ব্যক্তি আসল মুনাফিকে পরিণত হয়। এর দলীল- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

চারটি গুণ যে ব্যক্তির মাঝে পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মাঝে এগুলোর কোনো একটি গুণ পাওয়া যাবে তা না পরিত্যাগ করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকির গুণ বিদ্যমান থাকবে। সে চারটি গুণ হলো: তার নিকটে আমানত রাখলে খিয়ানত করে, যখন কথা বলে তখন মিথ্যা কথা বলে,

যখন অঙ্গিকার করে তা ভঙ্গ করে এবং ঝগড়ার সময় গালি-গালাজ করে ও খারাপ কথা বলে।[১৭]

যে ব্যক্তির মাঝে এ চারটি গুণ রয়েছে তার মাঝে সকল খারাবি এবং মুনাফিকের সকল গুণাবলি একত্রিত হয়েছে। যার মাঝে এর একটি গুণ রয়েছে তার মাঝে মুনাফিকির একটি গুণ রয়েছে। কখনো বান্দার মাঝে ভালোমন্দ গুণের সংমিশ্রণ হতে পারে। আবার অনেকের মাঝে ঈমান ও কুফরী এবং মুনাফিকির গুণাবলি একত্রিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। যে ব্যক্তি যেমন সওয়াব ও পাপের কাজ করবে তদনুযায়ী সে নেকী বা শাস্তির হকদার হবে। এ প্রকার নিফাকির উদাহরণ হলো মসজিদে জামাআতের সাথে সালাত আদায়ে অলসতা করা। এটা মুনাফিকদের গুণাবলির একটি। মুনাফিকি অত্যন্ত ভয়ানক ও খারাপ জিনিস। সাহাবাগণ মুনাফিকিতে জড়িয়ে যাওয়াকে খুব ভয় করতেন।

ইবনে আবী মুলাইকাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন: আমি আল্লাহর রসূলের ত্রিশ জন সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করেছি তাদের প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারে নিফাকির ভয়ে সদা শঙ্কিত থাকতেন।

বড় এবং ছোট নিফাকির মাঝে পার্থক্যসমূহ

১। বড় বা নিফাকে ইতিকাদ মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। বিপরীতে ছোট নিফাকির দরুন কোনো ব্যক্তি ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বের হয়ে যায় না।

২। বড় নিফাকি হলো আকীদাগত বিষয়ে কোনো ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অবস্থা দু'রকম হওয়া।

৩। মুমিন ব্যক্তির পক্ষ থেকে বড় নিফাকি সংঘটিত হয় না। অপর দিকে ছোট নিফাকী মুমিন ব্যক্তির পক্ষ থেকেও হয়ে যেতে পারে।

৪। বড় নিফাকিতে লিপ্ত ব্যক্তি সাধারণত তাওবা করে না। যদিও সে তাওবা করে তবে বিচারকের নিকটে তার তাওবা গ্রহণের ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। বিপরীতে ছোট নিফাককারী ব্যক্তি কখনো তাওবা করতে পারে এবং আল্লাহও তার তাওবা গ্রহণ করবেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (رحمه الله) বলেন: অনেক সময় মুমিন নিফাকির কোনো খারাবিতে জড়িয়ে যেতে পারেন। অতঃপর আল্লাহ তার

[১৭] সহীহ বুখারী হা/৩৪, ২৪৫৯, ৩১৭৮, সহীহ মুসলিম হা/৫৮,৫৯

তাওবা কবুল করেন। মুমিনের হৃদয়ে নিফাকি আবশ্যককারী কোনো কারণ উপস্থিত হলে আল্লাহ তা তার নিকট হতে দূর করে দেন। মুমিন শয়তান ও কুফরীর এমন বিভ্রান্তির দ্বারা পরীক্ষিত হয় যা তার হৃদয় সংকুচিত করে দেয়।

যেমন: সাহাবাগণ একদা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলেন: হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অনেকের হৃদয়ে এমন কিছু চিন্তা ভাবনা উদিত হয় যা বলার চেয়ে আকাশ থেকে পড়ে যাওয়াই উত্তম মনে হয়। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«ذلك صريح الإيمان»

এটাই হলো স্পষ্ট ঈমানের পরিচয়।[১৮]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: আমাদের হৃদয়ে এমন সব কথা উদ্রেক হয় যা বলা বা ভাষায় প্রকাশ করা খুব বড় পাপের কাজ বলে মনে হয়। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: «الحمدُ لله الذي ردَّ كيده إلى الوسوسة» সে আল্লাহর সকল প্রশংসা যিনি তার শাস্তিকে কু-মন্ত্রনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রেখেছেন।[১৯] অর্থাৎ হৃদয় থেকে প্রতিরোধ এবং এ কঠিন ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও এরূপ কুমন্ত্রনা আসা স্পষ্ট ঈমানের পরিচায়ক। পক্ষান্তরে বড় নিফাকি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿صُمٌّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لَا يَرۡجِعُونَ﴾

তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না। *সূরা বাকারা* ২:১৮

অর্থাৎ অভ্যন্তরীণভাবে তারা ইসলামের দিকে ফিরে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে আরো বলেন,

﴿أَوَلَا يَرَوۡنَ أَنَّهُمۡ يُفۡتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٖ مَّرَّةً أَوۡ مَرَّتَيۡنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمۡ يَذَّكَّرُونَ﴾

[১৮] সহীহ: মুসনাদে আহমাদ ও সহীহ মুসলিম হা/২৫৮, আবূ দাউদ হা/৫১১১।

[১৯] সহীহ: মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবূ দাউদ হা/৫১১২।

তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতি বছর তারা দু'একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে। অথচ তারা এরপরও তওবা করে না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না। *সূরা আত তাওবা ৯:১২৬।*

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন: বাহ্যিকভাবে তাদের তাওবা গ্রহণের ক্ষেত্রে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। কারণ সত্যিকার অর্থে মুনাফিক ব্যক্তি তাওবা করেছে কি-না তা জানা যায় না। কেননা মুনাফিক বাহ্যিকভাবে সব সময় ইসলাম প্রকাশ করে থাকে।[২০]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রতিটি বিষয়ের বর্ণনা: জাহিলিয়াত-ফাসিকী-পথভ্রষ্টতা ও রিদ্দাহ: মুরতাদের প্রকারভেদ ও বিধিবিধান

১। জাহিলিয়্যাত (الجاهلية):

ইসলাম আগমনের পূর্বে আরববাসী যে পরিস্থিতিতে ছিল তাকে জাহিলিয়্যাত বলা হয়। যেমন: আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং দীনের বিধিবিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা, বংশ নিয়ে দম্ভ করা, অহংকার ও জবর দখল করা ইত্যাদি।[২১] এর সাথে ছিল অজ্ঞতা-মূর্খতা এবং ইলমের অনুসরণ না করা।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন: যে ব্যক্তি সত্য জানে না সে সাধারণ জাহেল/অজ্ঞ। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতার সাথে ইলমের বিপরীত আকীদা পোষণ করে সে নিরেট মূর্খ। সত্য জেনে বা না জেনে যে ব্যক্তি সত্যের বিপরীতে কথা বলে সেও অজ্ঞদের তালিকাভুক্ত। যখন জাহিলিয়্যাত বা অজ্ঞতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে গেল তখন জানা দরকার যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনের পূর্বে মানুষ মূর্খ ও অজ্ঞতার সাথে সম্পৃক্ত ছিল, যে সকল কথা ও কাজে তারা লিপ্ত ছিল তা কোনো অজ্ঞ ব্যক্তিরই আবিষ্কার ছিল এবং তাতে জাহিল (অজ্ঞ) ব্যক্তিরাই লিপ্ত থাকতো। রসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাতু অস্সালাম) আনীত বিধানাবলির বিরোধীতা করাও অজ্ঞতা। তা হতে পারে ইয়াহূদীবাদ বা খ্রিষ্টীয় ধর্ম বা অন্য কিছু।

---

[২০] মাজমূ' ফাতাওয়া (২৮/৪৩৪-৪৩৫)।

[২১] আন্ নিহায়া লি-ইব্নিল আসীর (১/৩২৩)।

আর জাহিলিয়্যাত যুগে এসকল জাহিলিয়্যাত বা অজ্ঞতাই ব্যাপক আকার ধারণ করে ছিল। অপর দিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবূয়ত লাভের পর কোনো কোনো এলাকায় জাহিলিয়্যাত ছিল। যেমনঃ কাফির রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা। আবার কিছু ব্যক্তির মাঝেও অজ্ঞতা ছিল, যেমন ঐ ব্যক্তি যে ইসলাম গ্রহণ করেছে সে ইতিপূর্বে জাহিলিয়্যাতে ছিল, যদিও সে ইসলামী রাষ্ট্রে থাকুক না কেন। তবে যামানা বা সময়গত দিক দিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবূয়ত লাভের পর ব্যাপক জাহিলিয়াতের বিদায় ঘটেছে। কারণ, কিয়ামত পর্যন্ত তার উম্মাতের একটি দল সত্যের ওপর অবিচল থাকবে। স্বল্প পরিসরে কোনো মুসলিম এলাকায় এবং অনেক মুসলিম ব্যক্তির মাঝে মুর্খতা ও অজ্ঞতা পাওয়া যেতে পারে। যেমনঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ

আমার উম্মাতের মাঝে জাহিলিয়াতের চারটি বিষয় রয়েছে যা তারা ত্যাগ করতে পারবে না। বংশ নিয়ে গর্ব করা, অন্যের বংশকে দোষারোপ করা, তারকার মাধ্যমে প্রার্থনা করা এবং মৃতের জন্য বিলাপ করা।[২২] আবূ যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেনঃ

إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ

তোমার মাঝে জাহিলিয়্যাত রয়েছে।[২৩] অনুরূপ আরো অনেক হাদীস রয়েছে।[২৪]

উপরোক্ত আলোচনার সার কথা হলোঃ জাহ্‌ল তথা অজ্ঞতা বা মূর্খতার দিকে সর্ম্পৃক্ত করে জাহিলিয়্যাত বলা হয়। আর ইলম বা জ্ঞান শূন্যতাই হলো জাহিলিয়্যাত।

জাহিলিয়্যাত দু'প্রকারঃ

(১) আম/ব্যাপক জাহিলিয়্যাতঃ এটা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবূয়ত লাভের পূর্বে ছিল, তার নবূয়ত লাভের পর এ জাহিলিয়্যাত বিদায় নিয়েছে।

---

[২২] সহীহ মুসলিম হা/৯৩৪।

[২৩] সহীহ বুখারী হা/৩০, সহীহ মুসলিম হা/১৬৬১, আবূ দাউদ হা/৫১৫৭।

[২৪] ইকতিযাউস্ সিরাতুল মুস্তাকীম ১/২২৫-২২৭।

(২) কোনো দেশ, শহর বা ব্যক্তি কেন্দ্রীক জাহিলিয়্যাত (অজ্ঞতা): এটা এখনও বিদ্যমান। এর মাধ্যমে যারা বর্তমান বা বিংশ শতাব্দির জাহিলিয়্যাতকে আম তথা ব্যাপকভাবে উল্লেখ করে তাদের কথা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সঠিক হলো এরূপ বলা যে, বর্তমান শতাব্দির কিছু লোকের বা অধিকাংশ লোকের জাহিলিয়্যাত বা অজ্ঞতা। কিন্তু বর্তমান যুগে জাহিলিয়্যাতকে ব্যাপকভাবে উল্লেখ করা সঠিক ও জায়িয নয়। কারণ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবূওয়াতের পর আম বা ব্যাপক জাহিলিয়্যাত বিদায় নিয়েছে।

২। আল্ ফিস্ক (الفسق) বা ফাসিকী:

ফিস্ক শব্দের আভিধানিক অর্থ: বের হওয়া। ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় ফিস্ক বা ফাসিকী হলো: আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া। আল্লাহর আনুগত্য থেকে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক বের হওয়া উভয়কে ফিস্ক বা ফাসিকী বলা হয়। যেমন: পূর্ণ বের হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কাফিরকে ফাসিক বলা হয়। আর আল্লাহর আনুগত্য থেকে আংশিক বের হওয়ার ক্ষেত্রে কবীরা গুনাহকারী মুমিন ব্যক্তিকে ফাসিক বলা হয়। অতএব, বুঝা গেল ফাসিকী দু'প্রকার:

ক) এমন ফাসিকী যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়: আর এটা হলো কুফরী। এক্ষেত্রে কাফিরকেও ফাসিক বলা হয়। ইবলিসের উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন: فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। *সূরা আল্ কাহ্ফ ১৮:৫০।* আর শয়তানের এ ফাসিকী ছিল কুফরী। আল্লাহ তা'আলা বলেন: {وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ} পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। *সূরা আস সাজদা:২০।* এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহ কাফিরদেরকেই উদ্দেশ্য করেছেন। যার প্রমাণ বহন করে ঐ আয়াতেরই পরবর্তী অংশ,

﴿كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخۡرُجُواْ مِنۡهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمۡ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ﴾

যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের যে আযাবকে মিথ্যা বলতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর। *সূরা আস্ সাজদা ৩২:২০।*

খ) এমন ফাসিকী যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না: মুসলমানদের মাঝে যারা কবীরা গুনাহ করে তাদেরকে ফাসিক বলা হয়। তবে তার এ ফাসিকী তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾

যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই না-ফারমান। *সূরা আন নূর ২৪:৪।* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ﴾

(হজ্জের কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত) এসব মাসে যে লোক হজ্জের পরিপূর্ণ নিয়্যাত করবে, তার জন্য উক্ত সময়ে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ বিবাদ করা জায়েজ নয়। *সূরা আল্ বাকারা ২:১৯৭।* অত্র আয়াতে আলিমগণ ফুসূকের অর্থ করেছেন পাপ কাজ।[২৫]

৩। দ্বলাল বা পথভ্রষ্টতা (الضلال):

পথভ্রষ্টতা হলো সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে চলা। এটা হলো হিদায়াত বা সঠিক পথের বিপরীত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَّنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِي لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَاۚ﴾

যে কেউ সৎপথে চলে, তারা নিজের মঙ্গলের জন্যেই সৎ পথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের জন্যেই পথভ্রষ্ট হয়। *সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:১৫।*

দ্বলাল শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়:

১। কুফরী অর্থে: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا﴾

---

[২৫] কিতাবুল ঈমান, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (رحمه الله) ৩৭৮ পৃষ্ঠা।

যে আল্লাহর ওপর, তার ফেরেশতাদের ওপর, তার কিতাবসমূহের ওপর এবং রসূলগণের ওপর ও কিয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে। সূরা আন্ নিসা ৪:১৩৬।

২। শিরক অর্থে: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا﴾

যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়। সূরা আন্ নিসা ৪:১১৬।

৩। কখন কুফরীর চেয়ে ছোট ইসলাম বিরোধী কাজের অর্থে ব্যবহৃত হয়: যেমন বলা হয়: الفرق الضالة অর্থাৎ সঠিক পথ বিরোধী (পথভ্রষ্ট) দলসমূহ।

৪। কখনও ভ্রান্তির অর্থে ব্যবহৃত হয়: যেমন মূসা (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন:

﴿فَعَلۡتُهَآ إِذٗا وَأَنَا۠ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ﴾

মূসা বলল, আমি সে অপরাধ তখন করেছি, যখন আমি ভ্রান্ত ছিলাম। সূরা আশ্ শুআ'রা ২৬:২০।

৫। কখনও ভুলে যাওয়া (বিস্মৃতি) অর্থে ব্যবহৃত হয়: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ﴾

যাতে তাদের উভয়ের একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সূরা আল্ বাকারা ২:২৮২।

৬। হারিয়ে যাওয়া ও অনুপস্থিতির অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে: যেমন আরবরা বলে: ضالة الإبل (উটের হারিয়ে যাওয়া)।[২৬]

[২৬] আল্ মুফরাদাত লির রাগিব ২৯৭-২৯৮।

৪। রিদ্দাহ-الردة: ইসলাম ত্যাগ করা

রিদ্দাহ এর প্রকারভেদ ও তার বিধান:

রিদ্দাতুন শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো: الرجوع আর রুজূ' বা প্রত্যাবর্তন বা ফিরে আসা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾

আর তোমরা পেছনের দিকে প্রত্যাবর্তন কর না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। সূরা আল্ মায়িদা ৫:২১। অর্থাৎ তোমরা ফিরে আসিও না।

শরীআতের পরিভাষায় রিদ্দাতুন শব্দের অর্থ হলো: ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾

তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে। সূরা আল্ বাকারা ২:২১৭।

রিদ্দাহ বা ইসলাম ত্যাগের প্রকার: ইসলাম ভঙ্গকারী কোনো একটি কাজ করার ফলে মুসলিম ব্যক্তি মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী) হয়ে যায়। ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় অনেক। তবে সংক্ষেপে তা চার প্রকারে সীমাবদ্ধ। যা নিম্নরূপ:

১। কথার মাধ্যমে মুরতাদ হওয়া: যেমন, আল্লাহ তা'আলা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ফেরেশতাগণ (আলাইহিমুস্ সালাম) বা আল্লাহর কোনো রসূলকে গালি দেওয়া। অথবা ইলমে গায়িব বা নবূয়ত দাবি করা। অথবা যারা নবূয়ত দাবি করে তাদেরকে সত্যায়ণ করা। অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকটে দুয়া (প্রার্থনা) করা। অথবা আল্লাহ ছাড়া যা অন্য কেউ দিতে সক্ষম নয় সে বিষয়ে গাইরুল্লাহর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং এ বিষয়ে আল্লাহ ভিন্ন অন্যের আশ্রয় চাওয়া।

২। কর্মের মাধ্যমে মুরতাদ হওয়া: যেমন, মূর্তি, গাছ, পাথর, কবরকে সিজাদা করা এবং এগুলোর উদ্দেশ্যে জবাই করা। নাপাক স্থানে কুরআন নিক্ষেপ করা। জাদু করা, এটা শিক্ষা করা এবং অপরকে শিখানো। আল্লাহর

আইন বাদ দিয়ে মানব রচিত আইনকে বৈধ বিশ্বাস করে তা দিয়ে বিচার ফায়সালা করা।

৩। আকীদা বা বিশ্বাসগত দিক থেকে মুরতাদ হওয়া: যেমন, আল্লাহর শরীক (অংশীদার) রয়েছে বলে বিশ্বাস করা। অথবা এ বিশ্বাস করা যে, যিনা (ব্যাভিচার), মদ, সুদ হালাল। অথবা এ বিশ্বাস করা যে, রুটি হারাম, বা সালাত ওয়াজিব নয়। অনুরূপ কুরআন-হাদীস এবং সকল আলিমগণের ঐকমত্যে হালাল বা হারাম অথবা ওয়াজিব বিষয়ের বিরুদ্ধাচারণ করা। আর এগুলো এমন বিষয় যা অজানা নয়।

৪। উপরোক্ত বিষয়াবলির কোনোটির প্রতি সন্দেহ পোষণের মাধ্যমে মুরতাদ হওয়া: যেমন: শিরক হারাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা, ব্যভিচার ও মদ হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ করা। রুটি হালাল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করা। নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা অন্য কোনো নাবীর রিসালাত ও নবূয়ত বা তার সত্যবাদী হওয়ায় সন্দেহ পোষণ করা। ইসলাম ধর্ম অথবা বর্তমান যুগে তা উপযোগী হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ করা। এ সকল সন্দেহ মানুষকে মুরতাদ বানিয়ে দেয়।

৫। ত্যাগ (ছেড়ে) করার মাধ্যমে মুরতাদ হওয়া: যেমন- যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত সালাত ছেড়ে দেয় সে মুরতাদ হয়ে যায়। কারণ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

মুসলিম বান্দাহ এবং কুফরী ও শিরকের মাঝে পার্থক্য হলো সালাত পরিত্যাগ করা।[২৭] এছাড়াও বিভিন্ন দলীল রয়েছে যা প্রমাণ করে সালাত পরিত্যাগকারী কাফির।

মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী) ব্যক্তির বিধান

১। মুরতাদ ব্যক্তিকে তাওবা করতে বলতে হবে। যদি তাওবা করে তিন দিনের[২৮] মধ্যে দীন ইসলামে ফিরে আসে তবে তার এ তাওবা গ্রহণ করত তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

---

[২৭] সহীহ মুসলিম হা/৮২, ইবনে মাজাহ হা/১০৭৮।

[২৮] মুয়াত্তা মালিক (২/৭৩৭/১৬), বিচার সম্পর্কিত অধ্যায়: ইসলাম ত্যাগ করলে তার ফায়সালা পরিচ্ছেদ দেখুন। যঈফ, আল ইরওয়া হা/২৪৭৪।

২। যদি তাওবা করতে অস্বীকার করে তবে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। কারণ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

যে ব্যক্তি তার দীন পরিবর্তন করে অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে যায় তাকে তোমরা হত্যা করো।[২৯] (অবশ্য এটা মুসলিম সরকারের দায়িত্ব, নিজ হাতে আইন তুলে নিয়ে কাউকে হত্যা করা যাবে না-অনুবাদক।)

৩। তাওবা চাওয়াকালীন সময়ে (তিন দিন) তাকে তার মাল খরচ করতে দেয়া যাবে না। যদি তাওবা করে ফিরে আসে তবে এ মাল-সম্পদ তার। অন্যথায় তাকে হত্যা করা বা মুরতাদ অবস্থায় তার মৃত্যু হওয়ার পর হতে তা বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ হিসাবে মুসলিম বাইতুল মালে জমা হবে। অনেকে বলেছেন: উক্ত ব্যক্তি মুরতাদ হওয়ার পর থেকে তার সম্পদগুলো মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে।

৪। মুরতাদ ব্যক্তি এবং তার আত্মীয়দের মাঝে উত্তরাধিকার রহিত হয়ে যাবে। ফলে মুরতাদ ও তার আত্মীয়রা পরস্পর উত্তরাধিকার হবে না।

৫। যদি ঐ ব্যক্তি মুরতাদ অবস্থায় মারা যায় তবে তাকে গোসল দেয়া যাবে না, তার জানাযার সালাত আদায় করা হবে না এবং মুসলমানদের কবর স্থানে তাকে দাফন করা যাবে না। তাকে কাফির তথা অমুসলিমদের কবর স্থানে দাফন করতে হবে। অথবা মুসলমানদের কবরস্থান ব্যতীত অন্য যে কোনো স্থানে তার লাশ পুতে ফেলতে হবে।

---

[২৯] সহীহ বুখারী হা/৩০১৭, ইবনে মাজাহ হা/২৫৩৫, তিরমিযী হা/১৪৫৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এমন কিছু কথা ও কাজ যা তাওহীদ পরিপন্থি অথবা তাওহীদকে ক্রুটিযুক্ত করে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাতের তালু, কাপ-পেয়ালা পড়ে বা তারকা গণনার মাধ্যমে ইলমে গায়িব বা অদৃশ্য জ্ঞানের দাবি করা

ইলমে গায়িব দ্বারা উদ্দেশ্য: মানুষ যা দেখতে পায় না এবং ভবিষ্যত ও অতীত কালের যে সকল বিষয় মানুষের অগোচরে রয়েছে তাকে ইলমে গায়িব বা অদৃশ্যের জ্ঞান বলে। গায়িবের ইলমকে আল্লাহ তা'আলা কেবল নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ﴾

বলুন, আল্লাহ ব্যতীত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ গায়বের খবর জানে না। সূরা আন্ নাম্ল ২৭:৬৫।

অতএব, এক মাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়িব বা অদৃশ্যের খবর জানে না। তবে হিকমত ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ কখনো তার রসূলগণকে (আলাইহিমুস্ সলাতু অস্-সালাম) কিছু গায়িবের সংবাদ জানিয়ে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا ٢٦ إِلَّا مَنِ ٱرۡتَضَىٰ مِن رَّسُولٖ﴾

তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্ত তিনি অদৃশ্য বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তার মনোনীত রসূল ব্যতীত। সূরা আল্ জিন ৭২: ২৬-২৭।

অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ রিসালাতের জন্য চয়ন করেছেন তারা ব্যতীত অন্য কেউ আল্লাহর ঐ গায়িবী ইলমের সামান্য কিছু জানতে পারে না। আর রিসালাতের জন্য চয়নকৃত ব্যক্তিকেও আল্লাহ নিজের ইচ্ছায় কিছু ইলমে গায়িব দিয়ে থাকেন।

কারণ, মুজিযার (অলৌকিক ঘটনা যা মানুষ করতে পারে না) দ্বারা ঐ রসূলের নবূয়তের সত্যতার দলীল পেশ করা হয়। মুজিযার অন্যতম প্রকার হলো গায়িবী বিষয়ে সংবাদ দেওয়া। তাই আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো

রসূলকে (আলাইহিমুস্ সালাম) নিজ ইচ্ছামত কিছু গায়িবী বিষয়ে অবহিত করেন। আর এ রসূল ফেরেশতা বা মানুষ উভয়টি হতে পারেন।

আল্লাহ ফেরেশতা বা রসূল ছাড়া অন্য কাউকে গায়িবী ইলমের কোনো কিছু সংবাদ দেন না। সূরা জ্বিনের উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে "হাসর" তথা সীমাবদ্ধকরণ পদ্ধতি তাই প্রমাণ করে।

অতএব, আল্লাহ তার স্বীয় রসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাম) যাদেরকে ইলমে গায়িবের কিছু অংশ জানিয়েছেন তারা ব্যতীত অন্য কেউ যে কোনো উপায়ে ইলমে গায়িবের দাবি করলে সে মিথ্যাবাদী ও কাফির। চাই সে হাত বা পেয়ালা (চায়ের কাপ) পড়ে বা জ্যোতিষী বা জাদু বা তারকা গণনার মাধ্যমে অথবা অন্য যেকোন উপায়ে ইলমে গায়িবের দাবি করুক না কেন? ধুরন্দর এবং দাজ্জাল প্রকৃতির কিছু লোকদেরকে এমনটিই করতে দেখা যায়। ফলে তারা হারিয়ে যাওয়া বস্তুর স্থান, অনুপস্থিত দ্রব্যাদি এবং কিছু রোগের কারণ সম্পর্কে সংবাদ দেয়।

তারা বলেঃ অমুক ব্যক্তি তোমার জন্য এমন কাজ করেছে ফলে তুমি অসুস্থ্য হয়েছো। মূলত এক্ষেত্রে তারা জিন এবং শয়তানদেরকে ব্যবহার করে থাকে। তারা মানুষের নিকটে এমনভাব দেখায় যে, আল্লাহর বিশেষ বান্দা হওয়ার দরুন তারা এসবের সংবাদ দিতে পারে। অথচ এক্ষেত্রে তারা মানুষদেরকে ধোকা দিয়ে এবং ধুম্রজালে ফেলে জাদু, জ্যোতিষী এবং গণকের দ্বারাই কাজগুলো হাসিল করে থাকে। যা স্পষ্ট শিরক।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ জ্যোতিষীদের প্রত্যেকের একজন করে শয়তান বন্ধু রয়েছে। এ শয়তানেরা আসমান হতে চুরি করে যা শ্রবণ করে তার সাথে আরো অসংখ্য মিথ্যা মিলিয়ে এ সকল জ্যোতিষীদেরকে বিভিন্ন গায়িবী বিষয়ে সংবাদ দিয়ে থাকে। তিনি এও বলেছেন যে, এসকল জ্যোতিষী ও গণকদের অনেকের নিকটে শয়তানেরা বিভিন্ন প্রকার খাবার, ফল-মূল এবং হালুয়া ও অন্যান্য খাবার নিয়ে আসে যা এ স্থানে পাওয়া যায় না। আবার এদের অনেককে নিয়ে শয়তান জ্বিনেরা মক্কা বা বাইতুল মোকাদ্দাস অথবা অন্য কোনো স্থানে উড়ে বেড়ায়।[৩০]

কখনও তারা তারকা গণনা করে এসকল সংবাদ দিয়ে থাকে। আর তা হলো জ্যোতির্বিদ্যার ওপর নির্ভর করে দুনিয়ায় ঘটমান বিষয়াদির ওপর প্রমাণ গ্রহণ করা। যেমনঃ দমকা হাওয়া বওয়া এবং বৃষ্টি বর্ষন, বিভিন্ন দ্রব্যাদির মূল্য পরিবর্তন হওয়া। এছাড়াও আরো অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোর ক্ষেত্রে

---

[৩০] মাজমুআতুত্তাওহীদ ৭৯৭, ৮০১।

ধারণা করা হয় যে, তারকার চলার কক্ষ পথ, মিলন ও বিচ্ছেদ জানতে পারলে সেগুলো জানা সম্ভব।

তারা আরো বলে যে, অমুক তারকা থাকা কালীন যারা বিয়ে করবে তাদের ভাগ্যে এমন এমন ঘটবে। যারা অমুক তারকায় সফর করবে তার কপালে এমন হবে। যারা অমুক তারকা থাকাকালীন সময়ে জন্ম গ্রহণ করবে তাদের ভাগ্যে এমন শুভ লক্ষণ অথবা দুর্দশা (সুখ-দুঃখ) আসতে পারে। বিভিন্ন বাজে পত্রিকাসমূহে রাশি চক্রের গণনার মাধ্যমে কিছু উদ্ভট কথা লিখা হয়।

কতেক অজ্ঞ এবং দুর্বল ঈমানের লোক এসকল গণকদের নিকটে গিয়ে নিজেদের জীবনের ভবিষ্যত, বিয়ে শাদী ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।

যারা ইলমে গায়িবের দাবি করে অথবা যারা তাদেরকে বিশ্বাস করে তারা উভয়েই মুশরিক এবং কাফির। কারণ, তারা আল্লাহর বিশেষত্ব ও নির্দিষ্ট বিষয়ে তার অংশিদারের দাবি করে। তারকা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং তারই সৃষ্টি। কোনো বিষয়ে ভালোমন্দ করার ব্যাপারে তার কোনো হাত নেই। আর কোনো তারকা কাহারও দুর্ভাগ্য, সৌভাগ্য, মৃত্যু এবং বেঁচে থাকার প্রমাণ বহণ করে না। সমাজে এ ধরনের যা কিছু প্রচলিত রয়েছে তার সবই শয়তানদের কাজ। শয়তানেরা আসমান থেকে কিছু শ্রবণ করত তার সাথে হাজারো মিথ্যা মিশিয়ে জন সমাজে তা প্রকাশ ও প্রচার করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ জাদু, ভাগ্য গণনা এবং ভবিষ্যদ্বাণী করা

উল্লেখিত বিষয়সমূহ সবই শয়তানী ও হারাম কাজ যা সঠিক আকীদার পরিপন্থি ও তাতে ত্রুটিকারী বিষয়। কারণ, শিরকী কর্ম কান্ড ছাড়া তা সম্পাদিত হয় না।

ক। জাদুর সংজ্ঞা: জাদু এমন এক বিষয়ের নাম যার কারণ গোপন, সূক্ষ্ম ও উহ্য থাকে। জাদুকে আরবীতে সেহ্‌র বলে নাম করণের কারণ হলো তা এমন কিছু গোপন বিষয়াবলির মাধ্যমে করা হয় যা চোখে দেখা যায় না। এটা হলো কিছু মন্ত্র ও ঝাড় ফুঁক, কিছু কথা যা জাদুকর বলে, কিছু ঔষধ ও ধোঁয়া।

উল্লেখ্য জাদুর বাস্তবতা রয়েছে। কিছু জাদু হৃদয় ও শরীরে প্রভাব বিস্তার করে ফলে ঐ ব্যক্তি অসুস্থ্য হয়, কখনো মারা যায়। আবার কখনো জাদুর

মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা হয়। আর জাদুর এ প্রভাব আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য ও বিধিমোতাবেকেই সংঘটিত হয়ে থাকে। (এমন নয় যে আল্লাহ যা চান না, জাদুকরেরা তা করতে পারে)।

নিঃসন্দেহে জাদু শয়তানী কাজ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিরক এবং খারাপ-ঘৃণিত আত্মাসমূহের চাহিদা মত নৈকট্যলাভ ছাড়া এ জাদু ও তার প্রভাব হয় না। ঐ নাপাক প্রেতাত্মাগুলোকে আল্লাহর সাথে শরীক করা ব্যতীত জাদুকরের কার্য সিদ্ধি হয় না। সঙ্গত কারণেই শরীআত প্রবর্তক জাদুকে শিরকের সাথে সংযুক্ত করেছেন। যেমন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

তোমরা ধ্বংসাত্মক সাতটি বিষয় থেকে বেঁচে থাকো। সাহাবাগণ বললেন: ঐ সাতটি বিষয় কি হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং জাদু করা, আল্লাহর হারামকৃত আত্মাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত পলায়ন করা এবং সতী সাধ্বী মুমিনা নারীদেরকে যিনার অপবাদ দেয়া।[৩১]

জাদু দু'দিক দিয়ে শিরকের অন্তর্ভুক্ত:

প্রথম দিক: জাদুতে শয়তানদেরকে ব্যবহার করা হয়। তাদের সাথে গাঢ় সম্পর্ক রাখতে হয় এবং চাহিদানুযায়ী তাদের নৈকট্য অর্জন করতে হয়। বিনিময়ে তারা জাদুকরের প্রার্থিত খেদমত আঞ্জাম দেয়। অতএব, জাদু শয়তানের শিক্ষা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡرَ﴾

শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। *সূরা আল-বাকারা ২: ১০২।*

---

[৩১] সহীহ বুখারী হা/২৭৬৬, সহীহ মুসলিম হা/৮৯, আবূ দাউদ হা/২৮৭৪।

দ্বিতীয় দিক: জাদুতে ইলমে গায়িবের দাবি করা হয়। যা আল্লাহর সাথে শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আর এটা হলো কুফরী ও ভ্রষ্টতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدۡ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشۡتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَٰقٖۚ﴾

তারা ভালোরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোনো অংশ নেই। *সূরা আল-বাকারা ২:১০২।*

অবস্থা যদি এরূপই হয় তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জাদু করা শিরক ও কুফরী এবং সঠিক আকীদা নষ্টকারী বিষয়। যারা জাদু করে তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব। যেমন প্রথম সারির সাহাবাগণ জাদুকরদের একটি দলকে হত্যা করে ছিলেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে মানুষেরা জাদুকর ও জাদুর বিষয়টিকে সাধারণ চোখে দেখে। অনেকে আবার একে শিল্পকলা ও প্রযুক্তি হিসাবে গ্রহণ করেছে। যা দিয়ে তারা অন্যের ওপর অহংকার করে। জাদুকরদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে আজ বিভিন্ন প্রকার পুরস্কার দেয়া হচ্ছে। এ উপলক্ষে জাদুকরদের জন্য অনেক সভা, সমিতি ও প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। যাতে অসংখ্য কল্যাণকামী ও উৎসাহদানকারী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে থাকে। জাদুকে মানুষ আজ সার্কাস নামে আখ্যায়িত করেছে। এটা দীন সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা, আকীদার ক্ষেত্রে অবহেলা এবং খেল-তামাশাকারীদেরকে স্থান করে দেয়া ছাড়া আর কিছুই না।

খ। ভাগ্য গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী করা:

এটা ইলমে গায়িব ও অদৃশ্যের বিষয়াবলি জানার দাবি করা। যেমন, পৃথিবীতে ভবিষ্যতে কি আপতিত ও সংঘটিত হবে এবং হারানো বস্তুর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে সংবাদ দেয়া। আকাশের সংবাদ চুরিকারী শয়তানদেরকে ব্যবহার করে তারা এসব সংবাদ দিয়ে থাকে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هَلۡ أُنَبِّئُكُمۡ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَٰطِينُ ٢٢١ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٖ ٢٢٢ يُلۡقُونَ ٱلسَّمۡعَ وَأَكۡثَرُهُمۡ كَٰذِبُونَ﴾

আমি আপনাকে বলব কি কার ওপর শয়তানেরা অবতরণ করে? তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, গুনাহগারের ওপর। তারা শ্রুত কথা এনে দেয় এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। *সূরা আশ শু'আরা ২৬:২২১-২২৩।*

শয়তানরা ফেরেশতাদের কিছু কথা চুরি করে তা জ্যোতিষীদের কানে দেয়। জ্যোতিষী তখন ঐ একটি সত্য কথার সাথে আরো শত মিথ্যা কথা মিশিয়ে জনগণকে সংবাদ দেয়। আর আকাশ থেকে শ্রুত ঐ একটি সত্য কথা থাকার কারণে মানুষেরা উক্ত জ্যোতিষীকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। একমাত্র আল্লাহই কেবল ইলমে গায়িব জানেন।

অতএব, কেউ যদি জ্যোতিষী বা অন্য কোনো উপায়ে ইলমে গায়িবে আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্ব দাবি করে অথবা যারা ইলমে গায়িব দাবি করে তাদেরকে বিশ্বাস করে তবে সে আল্লাহর বিশেষত্বে অন্যকে শরীক করলো। জ্যোতির্বিদ্যা শিরক মুক্ত নয়। কারণ এতে শয়তানের চাহিদামত বিষয় দ্বারা তার নৈকট্য অর্জন করা হয়।

আল্লাহর ইলমে শরীকানার দাবি থাকায় ইলমে গায়িবের দাবিকে আল্লাহর রুবূবীয়্যাহতে শিরক করা হয়। অপর দিকে ইবাদতের কিছু অংশ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের জন্য সাব্যস্ত করায় এতে ইবাদতের ক্ষেত্রেও আল্লাহর সাথে শরীক করা হয়।

আবূ হুরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি স্ত্রীর মাসিক অবস্থায় অথবা স্ত্রীর পিছনের রাস্তায় সহবাস করে অথবা জ্যোতিষীর নিকটে এসে তার বলা কথাগুলো বিশ্বাস করে সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর নাযিলকৃত বিষয়াবলির সাথে কুফরী করে।[৩২]

একটি জরুরী সতর্কীকরণ: জাদুকর, জ্যোতিষী এবং গণকেরা মানুষের আকীদা নষ্ট করে। তারা নিজেদেরকে চিকিৎসকরূপে জাহির করত রোগীদেরকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে পশু জবাই করতে বলে। যেমন তারা বলে: এরূপ গুণ সম্পন্ন দুম্বা বা মুরগী জবাই করবেন। অথবা অনেক সময় তারা রোগীদেরকে বিভিন্ন শিরকী যাদু মন্ত্র এবং অবোধগম্য ও সুরক্ষিত শয়তানী তাবিজ কবচ লিখে দিয়ে তাদের গলায় ঝুলাতে বা বাক্সে অথবা বাড়ীতে রাখতে বলে।

---

[৩২] সহীহ: সুনানে ইবনে মাজাহ হা/৬৩৯।

অনেক জাদুকর ও গণক ইলমে গায়েবের খবর দিয়ে নিজে গায়েব জানার দাবি করে। লোকের হারানো বস্তুর সন্ধান স্থানসহ বলে দেয়। ফলে অজ্ঞ-মূর্খ জন সাধারণ তাদের হারানো বস্তু ফিরে পাবার আশায় তাদের নিকটে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আর এসুযোগে তারা তাদের অনুগত সহচর শয়তান দ্বারা সে সব বস্তুর সংবাদ বলে দেয় এবং তা এনে উপস্থিতও করে। এদের অনেকে আলৌকিক ঘটনা জাহিরের মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর ওলী বা শিল্পী ও কারিগর হিসাবে প্রকাশ করে। যেমন, আগুনের মাঝে প্রবেশ করা, অথচ আগুন তার কোনো ক্ষতি করে না।

অস্ত্র দিয়ে নিজেই নিজেকে প্রহার করা, অথবা নিজেকে গাড়ির চাকার নিচে নিক্ষেপ করা অথচ এতে তার কোনো ক্ষতি হয় না। এছাড়াও তারা আরো অনেক বিস্ময়কর কাজ করে দেখায় যা শয়তানী ও জাদু ছাড়া কিছুই নয়। মানুষদেরকে ফিতনায় ফেলার উদ্দেশ্যে তারা এরূপ করে থাকে। অথবা এগুলো নিছক খেয়ালী বিষয় বাস্তবতার সাথে যার সামান্যতম মিল নেই। বরং এগুলো গোপন কিছু কৌশল যার দ্বারা জনগনের চোখে ভেলকী লাগিয়ে দেওয়া হয়। যেমন, রশি ও লাঠি দ্বারা ফিরআউনের যাদুকরেরা সাপ বানিয়ে দেখিয়েছিল।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বাতায়িহিয়্যাহ্-আহমাদিয়্যাহ্-রিফাইয়্যাহ্ সম্প্রদায়ের সাথে সংঘটিত এক বিতর্ক সভার উল্লেখ করে বলেন:

বাতায়িহিয়্যাহ্ সম্প্রদায়ের এক বুযুর্গ গলাবাজি করে বলে যে, আমরা এমন শক্তি ও অলৌকিক ক্ষমতা রাখি যা অন্য কেউ রাখে না। যেমন: বিশেষ করে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি। সুতরাং সর্ব অবস্থায় আমরাই বিজয়ী।

তখন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) রাগান্বিত হয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলেন:

আমি পৃথিবীর পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্তের আহমাদী জামাআতের সকলকে চ্যালেঞ্জ করে বলছি, তারা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে যা করবে আমিও তাই করতে সদা প্রস্তুত। যে আগুনে জ্বলে যাবে সে হবে পরাজিত। আল্লাহর অভিশাপ তার ওপর বর্ষিত হোক।

তবে শর্ত হলো এ কাজ করার আগে আমাদের উভয়দলের লোকদের শরীর সিরকা (এক প্রকার অম্লস্বাদ পানীয়) এবং গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। তখন নেতা ও জনসাধারণ এ বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি

তাদেরকে বলেছিলাম: আগুনের তাপদাহ্ ও ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য তারা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। যেমন, ব্যাঙ্গের তৈল, জামিরের (কমলালেবু জাতীয় একটি ফল) খোসা এবং তালাক নামী পাথরের সংমিশ্রণে তারা এমন এক পদার্থ তৈরী করে যা ব্যবহার করে আগুনে ঝাঁপ দিলে আগুন শরীরের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। এটা শুনে মানুষেরা হৈ চৈ ও চিৎকার করতে লাগলো।

এতে করে ঐ আহমাদী বুযুর্গ তার শক্তি জাহির করতে বললো, আমার এবং আপনার শরীর ম্যাচের বারুদ দিয়ে মাখিয়ে বিশেষ এক প্রকার চাটাইয়ে জড়িয়ে আমাদেরকে ঘুরানো হবে। আমি তাকে বললাম, উঠ এবং চলো আমি এ কাজের জন্য প্রস্তুত আছি। এ বিষয়ে আমি তাকে তাগাদা দিতে লাগলাম। সে হাত বাড়িয়ে জামা খুলার ভান করলো।

তখন আমি তাকে বললাম: আমি তোমার সাথে এ কাজ করতে রাজি আছি। তবে তার আগে সিরকা ও গরম পানি দিয়ে তোমাকে গোসল করতে হবে। তখন তাদের অভ্যাস অনুযায়ী সে মানুষদের মাঝে সংশয় সৃষ্টির জন্য বললোঃ যারা বাদশাকে ভালোবাসে তারা যেন একটা করে লাঠি উপস্থিত করে। তখন আমি তাকে বললাম: এ হলো বাড়াবাড়ি এবং মানুষের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টির অপপ্রয়াস যার দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। বরং একটি মোম বাতি নিয়ে এসে জ্বালাও এবং আমাদের উভয়ের হাত ধৌত করার পর আমরা তাতে নিজেদের অঙ্গুলি প্রবেশ করাবো। আর যার অঙ্গুলি পুড়ে যাবে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক অথবা বলেছিলাম সে হবে পরাজিত। আমি এমন প্রস্তাব দিলে সে তা প্রত্যাখ্যান করে এবং লাঞ্ছিত হয়ে উক্ত স্থান ত্যাগ করে।[৩৩]

উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য: এ সকল দাজ্জালেরা এরূপ সূক্ষ্ম কৌশলে মানুষদের সামনে মিথ্যা বলে থাকে। যেমন: একটি চুল দিয়ে গাড়ি টেনে নিয়ে যাওয়া, নিজেকে গাড়ির চাকার তলে নিক্ষেপ করা, নিজের দু'চোখে লোহার শিঁক প্রবেশ করানো। এছাড়াও তারা আরো বিভিন্ন শয়তানী ভেলকী বাজী মানুষদেরকে দেখিয়ে থাকে।

---

[৩৩] মাজমূউল ফতোয়া ১১/৪৪৫-৪৪৬।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নৈকট্য লাভের জন্য মাযার ও কবরে নযর-মানত, উপঢৌকনপেশসহ এগুলোকে সম্মান করা

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিরকের দিকে ধাবিতকারী সকল রাস্তা বন্ধ করত তা থেকে সর্বাত্মক সতর্ক করে গেছেন। এ শিরকের আওতাভুক্ত হলো, কবরের মাসআলাটি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের ইবাদত এবং কবরস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা থেকে বাঁচার জন্য নিম্নে বর্ণিত মূলনীতিগুলো নির্ধারণ করেছেন:

১। ওলী এবং সৎ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। কারণ পরিশেষে তা ঐসকল ব্যক্তিদের ইবাদতের দিকে ধাবিত করে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ.

দীনের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি থেকে তোমরা বেঁচে থাকবে। কারণ, দীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িই তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে।[৩৪] তিনি আরো বলেন:

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ.

তোমরা আমাকে নিয়ে তেমন বাড়াবাড়ি করিও না যেমন খ্রিষ্টানেরা মরিয়ম তনয় ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি তো কেবল আল্লাহর একজন বান্দা মাত্র। অতএব, তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর রসূল বলো।[৩৫]

২। কবরের ওপর গম্বুজ নির্মাণ করতেও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। যেমন- আবুল হাইয়্যাজ আল্ আসাদী (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

---

[৩৪] সহীহ: সুনানে ইবনে মাজাহ হা/৩০২৯।

[৩৫] সহীহ বুখারী হা/৩৪৪৫।

قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ «أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ».

আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বললেন: আমি কি তোমাকে সেই বিষয় দিয়ে প্রেরণ করবো না যা দিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রেরণ করে ছিলেন? আর তা হলো, তুমি যত মূর্তি পাবে তা বিলুপ্ত করবে এবং যত উঁচু কবর পাবে তা মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে।[৩৬]

৩। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা এবং তার ওপর কোনো কিছু নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করণ, তার ওপর বসা এবং তার ওপর কোনো কিছু তৈরী করতে নিষেধ করেছেন।[৩৭]

৪। কবরের নিকটে সালাত আদায় করতেও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.

যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যু সমাগত হয় তখন তিনি একটি নকশাযুক্ত চাদর বার বার নিজের চেহারার ওপর দিচ্ছিলেন। যখন বিষণ্ন হয়ে যেতেন তখন তিনি তা নিজের চেহারা থেকে সরিয়ে নিতেন। ঐ অবস্থায় তিনি বলেন: ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ!! কারণ তারা তাদের নাবীগণের কবরসমূহকে মসজিদে পরিনত করেছিল। তাদের কর্ম থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মাতকে সতর্ক করেছেন।[৩৮] তিনি আরো বলেন:

وَلَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.

---

[৩৬] সহীহ মুসলিম হা/৯৬৯।

[৩৭] সহীহ মুসলিম ৯৭০।

[৩৮] সহীহ বুখারী হা/৪৩৫, সহীহ মুসলিম হা/৫৩১।

এমন যদি না হতো তবে ফাঁকা স্থানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দাফন করা হতো। তবে তিনি তার কবরকে মসজিদ বানানোর ভয় করছিলেন।[৩৯]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

সাবধান এবং সতর্ক হও! তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নাবী ও সৎব্যক্তিদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছিল, সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদে পরিণত করিওনা। আমি তোমাদিগকে এটা থেকে নিষেধ করছি।[৪০]

কবরকে মসজিদ বানানোর অর্থ: সেখানে সালাত আদায় করা যদিও তার উপরে মসজিদ তৈরী না করে। যে সকল স্থানে সালাত আদায় করা হয় তাকেই মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। যেমন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا.

যমীনের সকল (পবিত্র) স্থানকে আমার জন্য মসজিদ এবং পবিত্র মাটিকে পবিত্রকারী করা হয়েছে।[৪১]

কবরের ওপর যদি মসজিদ নির্মাণ করা হয় তবে বিষয়টি খুব কঠিনরূপ ধারণ করে। অধিকাংশ মানুষ এ সকল নিষেধ অমান্য করত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিষেধের বিরোধিতা করে চলেছে।

যার কারণে তারা শিরকে আকবারে পতিত হয়েছে। তাইতো দেখা যায় মানুষেরা আজ কবরের ওপর মসজিদ, সমাধি এবং খানকা নির্মাণ করে সেগুলোকে মাযারে পরিণত করত তথায় সকল প্রকার শিরকে আকবারের চর্চা করে চলেছে। যেমন: তার জন্য জবেহ্ করা, কবর বা মাযারস্থ ব্যক্তিকে আহ্বান করা তথা তার নিকটে কিছু প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করা। তাদের জন্য নযর মানত পেশ করা ইত্যাদী।

---

[৩৯] সহীহ: মুসনাদে আহমাদ ২৪৫১৩, ২৪৮৯৫।

[৪০] সহীহ মুসলিম হা/৫৩২, ইবনে আবী শাইবা হা/৭৫৪৬।

[৪১] সহীহ বুখারী হা/৩৩৫, ৪৩৮, তিরমিযী হা/১৫৫৩, নাসাঈ হা/৪৩২।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: (যারা আজ কবর বিষয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশ-নিষেধ, তার সাহাবাগণের নীতি এবং বর্তমান সময়ের মানুষদের আমলের মাঝে তুলনা করবেন তারা অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, উভয়টি পরস্পর বিরোধী এবং কর্তনকারী। (তিনি এটা তার সময়ের কথা বলেছেন, যা আজ আরো কঠিনরূপ ধারণ করেছে)। এ উভয় পথ কোনো দিন কোনো ক্রমেই এক হতে পারে না।

কারণ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরমুখী হয়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। আর এরা কবরের নিকটে সালাত আদায় করে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরকে মসজিদ বানাতে নিষেধ করেছেন, আর এসকল লোকেরা কি না কবরের ওপর মসজিদ বানিয়ে বসে আছে। আল্লাহর গৃহের বিরোধিতা করতে তারা এসবের নাম দিয়েছে মাশাহেদ বা তীর্থ বা পবিত্র স্থান। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের উপরে বাতি জ্বালাতে নিষেধ করেছেন, আর এরা তার ওপর মোম বাতি ও প্রদীপ জ্বালানোর জন্য লোক নিয়োগ করে রেখেছে।

তিনি কবরকে উৎসবের স্থান বানাতে নিষেধ করেছেন। অথচ এরা সেটাকে উৎসব ও উৎস্বর্গের স্থানে পরিণত করেছে। এ সকল স্থানে তারা ঈদের মতো বা তার চেয়েও বেশি সংখ্যা ও গুরুত্বসহকারে অধিক আগ্রহ নিয়ে উপস্থিত হয়।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরকে যমীন বরাবর করতে আদেশ দিয়েছেন। যেমন সহীহ মুসলিমে বর্ণিত,

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ.

আবুল হাইয়্যাজ আল্ আসাদী (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বললেন: আমি কি তোমাকে সেই বিষয় দিয়ে প্রেরণ করব না যা দিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রেরণ করে ছিলেন? আর তা হলো, তুমি যত মূর্তি পাবে তা বিলুপ্ত এবং যত উঁচু কবর পাবে তা মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে।[৪২]

[৪২] সহীহ মুসলিম হা/৯৬৯, মুসনাদে আহমাদ হা/৭৪১।

সহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُودِسَ فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا فَأَمَرَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا.

সুমামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা ফাযালাহ্ ইবনে উবাইদের সাথে রোম দেশের বেরুদিস এলাকায় থাকাকালীন সময়ে আমাদের এক সাথী ইন্তেকাল করলে ফাযালাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার কবরকে মাটির সমান্তরাল করতে বললে তাই করা হলো। এরপর তিনি বললেন: আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কবরকে মাটির সমান্তরাল করার আদেশ দিতে শুনেছি।[৪৩]

আর এরা কি না পূর্বোল্লেখিত হাদীস দু'টির বিরোধীতা করতে উঠে পড়ে লেগেছে? ফলে তারা কবরসমুহকে মাটি হতে উঁচু করে বাড়ি সদৃশ্য করত তার উপরে কুব্বা বা গম্বুজ নির্মাণ করা শুরু করেছে!!!

ইবনে কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: কবরের ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিধানাবলির ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশ নিষেধ এবং এদের কর্মকাণ্ডের মাঝের বিশাল পার্থক্যের কথা ভেবে দেখুন! এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বর্তমান সময়ে কবর কেন্দ্রিক যা কিছু হচ্ছে তাতে এমন ক্ষতি রয়েছে যা বান্দা গণনা করে শেষ করতে পারবে না। এরপর তিনি ঐক্ষতিগুলো উল্লেখ করা শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতের সময় যা শরীআত সম্মত করেছেন তা হলো:

পরকালকে স্মরণ করা, যিয়ারতকৃত (কবরস্থ) ব্যক্তির জন্য দুআ করত আল্লাহর রহমত, ক্ষমা এবং নিরাপত্তা কামনা করা। এর মাধ্যমে যিয়ারতকারী নিজের ও মৃত ব্যক্তির প্রতি দয়া করে থাকে।

আর এসকল মুশরিকরা বিষয়টির পট পরিবর্তন করে দীনের বিরোধীতা করা শুরু করত কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য করেছে:

আল্লাহর সাথে কবরস্থ ব্যক্তিকে শরীক করা, স্বয়ং তাকে ডাকা, তার মাধ্যমে দুআ করা, তার নিকটে নিজেদের প্রয়োজন পূরণের দরখাস্ত করা, কবরস্থ

[৪৩] সহীহ মুসলিম হা/৯৬৮, আবূ দাউদ হা/৩২১৯, নাসাঈ হা/২০৩০।

ব্যক্তির পক্ষ থেকে বরকত প্রার্থনা করা এবং নিজেদের শত্রুদের ওপর বিজয় চাওয়া ইত্যাদি।

ফলে তারা নিজেদের এবং মৃত ব্যক্তির প্রতি দয়া করার পরিবর্তে জঘন্য আচরণ করে। যিয়ারতকারী ও মৃত ব্যক্তি যদি উল্লিখিত দয়া হতে বঞ্চিত না হতো তবে আল্লাহ তা'আলা মৃত ব্যক্তির জন্য রহমত, ক্ষমা চাওয়াসহ অন্যান্য দুআ করা শরীআত সম্মত করতেন না।[৪৪]

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মাযার, ওরশ ইত্যাদির জন্য নযর, মানত, হাদীয়া, তোহফা ইত্যাদি পেশ করা শিরকে আকবার বা বড় শিরক। তার কারণ এতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবর বিষয়ক দিক নির্দেশনার বিরোধীতা করা হয়। যেমন: মসজিদসহ কবরের ওপর কোনো কিছু নির্মাণ না করা। কেননা, যখন কবরের ওপর গম্বুজ নির্মাণ করত তার পার্শ্বে মসজিদ ও মাযার নির্মাণ করা হয়েছে তখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা ধারণা করতে শুরু করেছে যে, অত্র কবরস্থ ব্যক্তিরা মানুষের উপকার করতে পারে অথবা অপকার করার ক্ষমতা রাখে। বিপদের সময় কেউ তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তাতে সাড়া দেন। যারা তাদের নিকটে আশ্রয় চায় তারা তাদেরকে আশ্রয় দেয়। ফলে এসকল অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যক্তিরা মৃত ব্যক্তি ও মাযারের জন্য নযর মানত পেশ করা শুরু করে। এমনকি তা এমন মূর্তিতে রুপান্তরিত হয়েছে মানুষেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার ইবাদত করতে শুরু করেছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَناً يُعْبَدُ.

হে আল্লাহ, তুমি আমার কবরকে এমন মূর্তিতে পরিণত করো না যে, মানুষেরা যার ইবাদত করা শুরু করে।[৪৫]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্য এ দুআ করেছেন যে, এ উম্মাতের কিছু লোক এরূপ করবে। অনেক মুসলিম দেশে কবর কেন্দ্রিক এ সকল শিরক ব্যাপকহারে বিস্তার লাভ করেছে।

অপর দিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুআর বরকতে আল্লাহ তা'আলা তার কবরকে শিরক থেকে হিফাযত করেছেন। যদিও তার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে অজ্ঞ এবং অপসংস্কৃতিতে বিশ্বাসীদের দ্বারা বেশ কিছু ইসলাম বিরোধী কাজ হতে দেখা যায়। তবে

[৪৪] ইগাসাতুল্ লেহ্ফান (১/২১৪, ২১৫, ২১৭ পৃষ্ঠা)।

[৪৫] সহীহ: মুয়াত্তা মালিক ৫৭০ ও মুসনাদে আহমাদ।

তারা তার কবর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। কারণ তার কবর তার বাড়ীতে, মসজিদে নয়। আর তা কয়েকটি প্রাচীর দ্বারা ঘিরে রাখা হয়েছে।

আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: আল্লাহ তা'আলা তার দুআ কবুল করেছেন। তাই তো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবরকে তিনটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করে রাখা হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভাস্কর্য ও প্রতিমা এবং স্মৃতিসৌধের প্রতি সম্মান করার বিধান

التماثيل "তামাসীল" শব্দটি تمثال তিমসাল শব্দের বহুবচন। তিমসাল (ভাস্কর্য ও প্রতিমা) হলো: মানুষ, জীব-জন্তু অথবা অন্য কোনো প্রাণীর আকৃতি বিশিষ্ট মূর্তি।

নুসুব (স্মৃতিসৌধ) শব্দটির মূল অর্থ হলো- ঐ নিদর্শন (কোনো প্রাণহীন জিনিসের আকৃতিতে নির্মিত প্রতীকী চিহ্ন) বা পাথর যার নিকটে মুশরিকরা নিজেদের পশু যবাই করতো। সুতরাং স্মৃতিসৌধ হল এমন মূর্তি যা মুশরিকরা নিজেদের নেতা বা সমাজপতির স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে ফাঁকা কোনো স্থানে তৈরী করতো।

আত্মা বা প্রাণ বিশিষ্ট জিনিসের ছবি তৈরী করা থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক ও সাবধান করে গেছেন। বিশেষত মানুষদের মাঝে যাদেরকে সম্মান করা হয়। যেমন: জ্ঞানী-গুণী, কোনো আলেম, রাজা-বাদশাহ, আবেদ বা ধর্ম জাযক (তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন পীর), নেতা এবং সমাজপতিদের মূর্তি তৈরী করা। (বিশেষ প্রয়োজনে ক্যামেরার মাধ্যমে তোলা সীমিত সংখ্যক ছবিকে আলেমগণ জায়িয বলেছেন। যেমন: পাসপোর্ট বা এধরনের কাজের জন্য ছবি তোলা)।

এসকল মূর্তি (ছবি) বিভিন্ন পদ্ধতিতে হতে পারে যার সবগুলোই নিষিদ্ধ। যেমন: সাইনবোর্ড, কাগজ, দেয়াল ও কাপড়ের ওপর অংকিত ছবি। বর্তমান যুগে প্রচলিত ক্যামেরা বা অন্য কোনো অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে তোলা ছবি। অথবা খোদাই করে কোনো মূর্তি বা ছবি তৈরী করা, মূর্তির আকৃতিতে কোনো ছবি নির্মাণ করা ইত্যাদি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেয়াল ও অনুরূপ স্থানসমূহে ছবি টাঙ্গাতে নিষেধ করেছেন। তিনি নিষেধ করেছেন মূর্তির আকৃতিতে প্রাণ বিশিষ্ট বস্তুর দেহ তৈরী করতে। যার অন্যতম হলো স্মৃতি স্তম্ভ, কারণ তা শিরকে পতিত করার মাধ্যম। কেননা,

ছবি ও প্রতিমা নির্মাণের কারণেই পৃথিবীতে সর্ব প্রথম শিরকের সূত্রপাত হয়। আর সে ঘটনা ছিল নিম্নরূপ:

নূহ্ (আলাইহিস সালাম) এর কওমে বেশ কিছু সৎ ব্যক্তি ছিলেন। যখন তারা ইন্তেকাল করলেন তখন তাদের কওমের লোকেরা তাদের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়লো। তখন শয়তান তাদেরকে এ ভ্রান্ত পরামর্শ দিল যে, যে সকল স্থানে তারা বসতেন সেখানে তোমরা তাদের মূর্তি তৈরী করে তাদের নামে নাম করণ কর। তারা তাই করল। তবে শুরুতেই তারা এ মূর্তিগুলোর ইবাদত বা পূজা শুরু করেনি। যখন এ প্রজন্মের লোকেরা ইন্তেকাল করল এবং পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা মূর্তি তৈরীর প্রকৃত কারণ ও রহস্য ভুলে গেল তখন এ মূর্তিগুলোর ইবাদত করা শুরু করে দিল।[৪৬]

যখন আল্লাহ তা'আলা তার নবী নূহ্ (আলাইহিস সালাম) কে এসকল মূর্তির কারণে উদ্ভূত শিরক থেকে নিষেধ করলেন তখন তারা তার দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করলো। আর ঐসকল ব্যক্তির মূর্তিগুলো যা মূর্তিপূজাতে রুপান্তরিত হয়ে ছিল তার ইবাদতে তারা অবিচল রইল। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা তার নিজের ভাষায় বর্ণনা করেন,

﴿وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمۡ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّٗا وَلَا سُوَاعٗا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسۡرٗا﴾

তারা বলছে- তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে। সূরা নূহ ৭১: ২৩।

এটা ঐসকল লোকদের নাম যাদের স্মরণ ও সম্মানার্থে লোকেরা তাদের আকৃতি-অবয়বে এ সকল মূর্তি তৈরী করে ছিল। আপনি লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, এ সকল স্মৃতি স্তম্ভ ও প্রতিমাসমূহ যা কেবল তাদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের স্মরণে ও তাদের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য তৈরী করা হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাথে শিরক ও তদীয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘোর বিরোধীতারই জন্ম দিয়েছে!

সঙ্গত কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মহা প্লাবন দিয়ে ধ্বংস করে দেন এবং আল্লাহ ও তার বান্দাদের নিকটে এরা ঘৃণিত ও অপছন্দনীয় হয়ে যায়। (ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর কওমের শিরক ছিল মূর্তি পূজা এবং দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান করা। বানী ইসরাঈল কওমের শিরক ছিল গোবৎসের পূজা করা। যা সামেরী নামক এক ব্যক্তি স্বর্ণ থেকে তাদের জন্য তৈরী করেছিল। খ্রিষ্টানদের

---

[৪৬] সহীহ বুখারী হা/৪৯২০।

শিরক হলো ক্রুসের পূজা করা, যাকে তারা ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর মূর্তি বা আকৃতি বলে ধারণা করে)।

এটা ছবি ও মূর্তি অংকনের ভয়াবহতার প্রমাণ বহন করে। এজন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফটোগ্রাফার ও চিত্র শিল্পীদেরকে অভিশাপ করত সংবাদ দিয়েছেন যে, এরা কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। যে কোনো ছবি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুছে ফেলার আদেশ দিয়ে বলেছেন, যে ঘরে ছবি বা মূর্তি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। এসব কিছুই উম্মাতের আকীদা (বিশ্বাস) ও অন্যান্য ক্ষেত্রে চরম ক্ষতির দরুনই তিনি বর্ণনা করেছেন। কারণ, ছবি ও মূর্তি নির্মাণ ও অংকনের দরুনই পৃথিবীতে সর্ব প্রথম শিরক উদ্ভাবন হয়ে ছিল। এসকল মূর্তি ও ছবি বিভিন্ন মজলিস, ফাঁকা ময়দান এবং বাগান যেখানেই স্থাপন করা হোক তা সর্বাবস্থাতেই শরীআতের পক্ষ থেকে হারাম (নিষিদ্ধ)। কেননা, এটা শিরক ও আকীদা ভ্রষ্টের প্রধান কারণ।

বর্তমান সময়ে কাফিররা এ সকল নিষিদ্ধ কাজ চর্চা করে চলেছে। কারণ, তাদের এমন কোনো আকীদা (বিশ্বাস) নেই যা তারা সংরক্ষণ করে। অপর দিকে মুসলমানদের সৌভাগ্য ও শক্তির উৎস নিজেদের আকীদা (বিশ্বাস) সংরক্ষণার্থে কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য রক্ষা করত এ সকল নিষিদ্ধ কাজে তাদের শরীক হওয়া জায়িয নয়। একথা বলা ঠিক হবে না যে, বর্তমান সময়ের লোকেরা এ স্তর অতিক্রম করে তাওহীদ ও শিরক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন করেছে। কারণ, শয়তান ভবিষ্যত প্রজন্মের অজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগের পানে চেয়ে আছে। যেমন, নূহ্ (আলাইহিস সালাম) এর কওমের আলেমদের মৃত্যু ও অজ্ঞতা বৃদ্ধির ফলে তাদের মাঝে মূর্তি পূজা শুরু হয়। আর জীবিত ব্যক্তির বেলায়ও ফিৎনার বিষয়ে নির্ভয় হওয়া যায় না। যেমন ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন:

﴿وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَٰذَا ٱلۡبَلَدَ ءَامِنٗا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلۡأَصۡنَامَ﴾

আর স্মরণ কর ঐ সময়ের কথা যখন ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন, হে আল্লাহ, তুমি এ শহরকে (মক্কাকে) নিরাপদ করে দাও এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততীকে মূর্তিপূজা থেকে হিফাযত করো। *সূরা ইবরাহীম ১৪:৩৫।*

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) নিজের উপরে ফিতনার ভয় করে ছিলেন। সালাফগণের অন্যতম ইমাম ইবরাহীম নাখঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর পরে কে ফিতনা থেকে নিরাপদ হতে পারে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দীন (ইসলাম) নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং তার সম্মানহানী করার বিধান

দীন (ইসলাম) নিয়ে কেউ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলে সে মুরতাদ হয় অর্থাৎ দীন থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে -আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۝٦٥ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْۚ﴾

আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তার হুকুম আহকামের সাথে এবং তার রসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলে? ছলনা করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ। *সূরা আত-তাওবা ৯:৬৫-৬৬।*

অত্র আয়াত প্রমাণ করে আল্লাহ, তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার বিধি-বিধানের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা কুফরী। যে ব্যক্তি এগুলোর কোনো একটির সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে সে যেন সবগুলোর সাথেই ঠাট্টা-বিদ্রুপ করলো। কিছু মুনাফিক লোক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাগণকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করলে আল্লাহ উপরোক্ত আয়াতগুলো নাযিল করেন।

দীনি এসকল বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করলে আবশ্যিকভাবে ঐ ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। অতএব, যারা আল্লাহর একত্বকে হালকা ভেবে তাকে ভিন্ন অন্য কোনো মৃত ব্যক্তির নিকটে দুআ করাকে মর্যাদাকর মনে করে সে কাফির। এমনিভাবে তাওহীদের পথে আহ্বান এবং শিরক থেকে নিষেধ করলে যে সকল লোক এটাকে হালকা চোখে দেখে তারা কুফরী করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ۝٤١ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَاۚ﴾

তারা যখন আপনাকে দেখে তখন আপনাকে কেবল বিদ্রূপের পাত্ররূপে গ্রহণ করে। বলে- এই কি সেই লোক যাকে আল্লাহ রসূল করে প্রেরণ করেছেন? সে তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণের কাছ থেকে সরিয়েই দিত, যদি আমরা তাদেরকে আঁকড়ে ধরে না থাকতাম। *সূরা আল্ ফুরকান ২৫: ৪১-৪২।*

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাফিরদেরকে আল্লাহর সাথে শিরক করা হতে নিষেধ করেন তখন তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপে মেতে উঠে। মুশরিকদের অন্তরে শিরকের সম্মান থাকার দরুন যখনি নাবী-রসূলগণ (আলাইহিমুস্ সলাতু অস্ সালাম) তাদেরকে তাওহীদের পথে আহ্বান করেছেন তখনি তারা তাদেরকে (আলাইহিমুস্ সলাতু অস্ সালাম) দোষারোপ করত নির্বোধ, পথভ্রষ্ট এবং পাগল বলে আখ্যায়িত করেছে। মুশরিক ও তাদের দোসরদের এ নীতি আজও চালু আছে। অনুরূপ যাদের নিকটে শিরক রয়েছে তারাও তাওহীদ পন্থি দায়ীগণকে দেখলে তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ﴾

আর কোনো লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে। *সূরা আল্ বাকারা ২:১৬৫।*

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসার মতো কোনো মাখলুক বা সৃষ্টিজীবকে ভালোবাসলে সে মুশরিক। আল্লাহর রাস্তায় ভালোবাসা এবং আল্লাহর সাথে ভালোবাসার মাঝে পার্থক্য করা ফরয। (আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অনুরূপ ভালোবাসা শিরক ও কুফরী, আল্লাহর রাস্তায় কাউকে ভালোবাসা ঈমানের পরিচয়)।

বর্তমান যুগের যে সকল লোকেরা কবরকে মূর্তিতে রূপান্তরিত করেছে তারা আল্লাহর তাওহীদ (একত্ব) ও তার খালেস ইবাদকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদেরকে সুপারিশকারী হিসাবে গ্রহণ করেছে তাদেরকে সম্মান করে। অনেকে আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করতে দ্বিধা করে না! অপর দিকে তার পীর বা বুযুর্গের নামে মিথ্যা শপথ করতে সাহস পায় না!

অনেক তরীকতপন্থিরা মনে করে বিপদ মূহুর্তে রাতের শেষ ভাগে উঠে মসজিদে আল্লাহকে আহ্বান করার চেয়ে পীরের কবরের নিকটে গিয়ে বা অন্য স্থান হতে পীরসাহেবকে আহ্বান করা অধিক উপকারী!! যারা এদের তরীকা থেকে সরে তাওহীদের পথে আসে তাদেরকে নিয়ে এরা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। এদের বেশির ভাগ লোক আজ মসজিদ পরিত্যাগ করে খানকা ও মাযার নির্মাণে ব্যস্ত। মূলত এরা শিরককে সম্মান এবং আল্লাহ, তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার বিধিবিধানকে হালকা চোখে দেখার

জন্যই তারা এরূপটি করে থাকে?[৪৭] বর্তমান সময়ে মাযার ভক্তদের মাঝে এটা ব্যাপক হারে প্রচলিত রয়েছে।

ঠাট্টা বিদ্রূপ দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: প্রত্যক্ষ বা স্পষ্ট ঠাট্টা-বিদ্রূপ: এ প্রকার ঠাট্টাকারীদের ব্যাপারেই সূরাহ্ তাওবার ৬৫-৬৬ নং আয়াত নাযিল হয়েছে। তারা সাহাবাগণ এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে বলেছিল: আমরা আমাদের এই কারী বা কুরআন পাঠকদের চেয়ে (সাহাবাগণের চেয়ে) অধিক পেটুক, মিথ্যাবাদী এবং যুদ্ধের ময়দানে এদের মত কাপুরুষ আর কাউকে দেখিনি। এতদ্ব্যতীত তাদের আরো কটুক্তিসমূহ।

যেমন অনেকে বলে: তোমাদের এ দীন (সহীহ তাওহীদী দীন) পঞ্চম দীন। অনেকে এও বলে: তোমাদের দীন হলো বেআইনী ও নির্জীব। অনেকে আবার সৎ কাজের আদেশ প্রদানকারী এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধকারীদেরকে দেখলে ঠাট্টার ছলে বলে: তোমাদের নিকটে দীনদার লোকেরা আসছে। ঠাট্টার ছলে অনেকে এমন অনেক কথা বলে থাকে যা গণনা করা খুবই কষ্ট সাধ্য! অথচ যাদের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ঠাট্টার আয়াত নাযিল হয়েছে তাদের উক্তির চেয়ে এদের উক্তি আরো মারাত্মক।

দ্বিতীয় প্রকার: পরোক্ষ বা অস্পষ্ট ঠাট্টা-বিদ্রূপ: এটা এক সমুদ্র যার কোনো কুল-কিনারা নেই। যেমন: কুরআন তিলাওয়াত বা হাদীস পাঠ এবং ভালো কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজ হতে নিষেধের সময় চোখের ইশারা বা জিহ্বা বের করে বিদ্রূপ করা, ঠোঁট ভেংচানো এবং হাতের বিভিন্ন অঙ্গ-ভঙ্গির মাধ্যমে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা।

এরই আওতাভূক্ত হবে কতেকের উক্তি: বিংশ শতাব্দির জন্য ইসলাম প্রযোজ্য নয়। মধ্যযুগের জন্য ইসলাম ঠিক ছিল। ইসলামে ফিরে গেলে আমরা পশ্চাতে ফিরে যাবো। শাস্তি প্রয়োগ এবং দেশান্তরসহ অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে ইসলামে চরম কঠোরতা, পাশবিকতা এবং বর্বরতা রয়েছে।

ইসলাম নারীকে তার যথাযথ অধিকার দেয়নি। কারণ ইসলামে তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ) এবং একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

অনেকে আবার বলে: ইসলামী আইনের মাধ্যমে বিচার কার্য পরিচালনার চেয়ে মানব রচিত মতবাদ দিয়ে বিচার কার্য সম্পাদন করা অধিক উত্তম। ঠাট্টা-বিদ্রূপের আওতায় পড়বে ঐসকল লোকদের কথা যারা তাওহীদের

---

[৪৭] মাজমূউল ফতোওয়া ১৫/৪৮-৪৯।

পথে আহ্বানকারী এবং কবর, মাযার ও খানকার বিরোধীতাকারীদেরকে বলেঃ আপনি সীমালঙ্ঘনকারী, মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে চান, আপনি ওহ্হাবী, এটা পঞ্চম মাযহাব এবং অনুরূপ আরো উক্তিসমূহ যার সবগুলোই দীন ইসলাম ও সত্যিকার মুসলিমদেরকে গালি দেওয়া এবং বিশুদ্ধ আকীদা নিয়ে কটাক্ষ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সৎ কাজের তৌফীকদাতা এবং অসৎ কাজ হতে বিরত রাখার ক্ষমতা অন্য কারো নেই।

এ কটাক্ষের আওতায় পড়বে যারা সুন্নাতের ওপর আমলকারী কোনো ব্যক্তিকে দেখে বিদ্রূপের ছলে বলেঃ চুলের মাঝে দীন নেই। এদ্বারা তারা দাড়ি লম্বা করাকে বিদ্রূপ করে। এ নির্লজ্জ উক্তির অনুরূপ যাবতীয় কথা-বার্তা ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও কটাক্ষের অন্তর্ভুক্ত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মানব রচিত বিধান দিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করা

আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তার ইবাদতের চাহিদা হলোঃ

আল্লাহর বিধানাবলির অনুগত হয়ে তার শরীআতের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। কথা-কাজ, আকীদা (বিশ্বাস), ঝগড়া-বিবাদ, রক্তপণ, সম্পদ এবং যাবতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। কারণ, আল্লাহ তা'আলাই হলেন মহান বিচারক এবং সকল বিধানও তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। অতএব বিচারকদের ওপর ফরয হলো আল্লাহর বিধানুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা করা। প্রজাদের ওপর ও ফরয হলো তারা আল্লাহর কিতাব এবং তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিধান মোতাবেক বিচার কার্যের ফায়সালা চাইবেন। নেতা ও বিচারকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا﴾

আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোনো বিচার-

মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায় ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী। *সূরা আন্ নিসা ৪:৫৮।* প্রজাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তার রসূলের দিকে প্রত্যর্পণ কর-যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। *সূরা আন্ নিসা ৪: ৫৯।*

এরপর আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন যে, মানব রচিত বিধান দিয়ে বিচার ফায়সালা করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান এক সাথে থাকতে পারে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানব রচিত বিধান দিয়ে বিচার ফায়সালা করে সে মুমিন থাকে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِۦۖ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا ۝٦٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ۝٦١ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَـٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَـٰنًا وَتَوْفِيقًا ۝٦٢ أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ قَوْلًۢا بَلِيغًا ۝٦٣ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝٦٤ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি অবর্তীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবর্তীণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। আর যখন আপনি তাদেরকে বলবেন, আল্লাহর নির্দেশের দিকে এসো-যা তিনি রসূলের প্রতি নাযিল করেছেন, তখন আপনি মুনাফেকদিগকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে সরে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় যদি তাদের কৃতকর্মের দরুন বিপদ আরোপিত হয়, তবে তাতে কি হল! অতঃপর তারা আপনার কাছে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে খেয়ে ফিরে আসবে যে, মঙ্গল ও সম্প্রীতি ছাড়া আমাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। এরা হলো সে সমস্ত লোক, যাদের মনের গোপন বিষয় সম্পর্কেও আল্লাহ তা'আলা অবগত। অতএব, আপনি ওদেরকে উপেক্ষা করুন এবং ওদেরকে সদুপদেশ দিয়ে এমন কোনো কথা বলুন যা তাদের জন্য কল্যাণকর। বস্তুত আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়। আর সেসব লোক যখন নিজেদের অনিষ্ট সাধন করেছিল, তখন যদি আপনার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রসূলও যদি তাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দিতেন। অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত। অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা না থাকে এবং তা হৃষ্টচিত্তে মেনে না নিবে। *সূরা আন্ নিসা ৪:৬০-৬৫।*

উপরোক্ত আয়াতগুলো আল্লাহ তা'আলা শপথ দ্বারা নিশ্চিত করে বলেছেন: যারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বিচারক মানে না, তার বিচারে সন্তুষ্ট হয়ে তা মেনে নেয় না তারা মুমিন নয়।

এমনিভাবে যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানাবলি অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা (ফায়সালা) করে না আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কাফির, যালিম এবং ফাসিক বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}

যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের। *সূরা আল্ মায়িদা ৫:৪৪।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}

যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করেনা তারাই যালিম। *সূরা আল্ মায়িদা ৫:৪৫।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}

যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই ফাসিক-পাপাচারী। *সূরা আল্ মায়িদা ৫:৪৭।*

আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার করা আবশ্যক। আলিমগণের মাঝে ইজতিহাদী তথা গবেষণামূলক বিষয়ের মতবিরোধপূর্ণ যাবতীয় স্থানে আল্লাহর বিধান ও রসূলের সুন্নাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। অতএব, বিশেষ কোনো মাযহাব বা ইমামের মতকে গোঁড়ামীবশত গ্রহণ করা যাবে না। বরং কুরআন ও হাদীসের দলীল সম্মত কথাকেই গ্রহণ করতে হবে।

শুধু ব্যক্তিগত বিষয়ে নয় (যেমন ইসলামী নামধারী কিছু দেশে দেখা যায়) বরং মামলা-মোকাদ্দমা এবং অধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় বিরোধপূর্ণ বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর বিধানকেই মানতে হবে। কারণ ইসলাম পরিপূর্ণ যা খণ্ড খণ্ড করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। *সূরা আল-বাকারা ২:২০৮।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾

তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দূর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনো পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। *সূরা আল-বাকারা ২:৮৫।*

বিভিন্ন মাযহাব ও আধুনিক সিলেবাস বা পাঠ্যক্রমের অনুসারীদের ওপর ফরয হলো, তারা যেন স্বীয় ইমামগণের উক্তিসমূহকে কুরআন ও হাদীসের সামনে পেশ করে। যা এ দু'য়ের সাথে মিলবে তা গ্রহণ করবে এবং যা বিরোধী হবে গোঁড়ামী এবং পক্ষাবলম্বন ব্যতীত তা প্রত্যাখ্যান করবে। বিশেষত আকীদা (বিশ্বাস) বিষয়ে। কারণ ইমামগণ এরই অসিয়ত করেছেন। এটাই সকল ইমামের মত-মাযহাব ও পথ-মানহায। তাই যে ব্যক্তি এর বিপরীত করবে সে তাদের অনুসারী নয়। যদিও সে নিজেকে ইমামগণের দিকে সম্বন্ধিত করুক না কেন। আর এ ব্যক্তি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ﴾

তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তারা তার শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র। *সূরা আত-তাওবা ৯:৩১।*

উপরোক্ত আয়াতটি কেবল খ্রিষ্টানদের ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট নয়। বরং যারাই তাদের অনুরূপ কাজ করবে তারই এ আয়াতের আওতায় পড়বে। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশের বিরোধীতা করে, তাদের বিধান ব্যতিরেকে মানুষের মাঝে ফায়সালা করবে অথবা প্রবৃত্তির অনুসরণ করত মানব রচিত বিধান দিয়ে ফায়সালা করার খাহেশ রাখে সে ব্যক্তি তার ঘাড় থেকে ইসলাম ও ঈমানের রজ্জুকে নামিয়ে ফেলল। যদিও সে নিজেকে মুমিন বলে দাবি করে। কারণ, যারা এরূপ করতে চায় আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতিবাদ করত তাদের ঈমানকে নাকচ করে বলেন,

﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦۖ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا﴾

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে

চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। *সূরা আন্ নিসা ৪:৬০।*

উপরোক্ত আয়াতে "ইয়াযউমূনা" শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ তাদের ঈমানকে বাতিল বলে গণ্য করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয়ে মিথ্যা দাবি করলে বলা হয় "ইয়াযউমূনা"। কেননা, সে তার দাবিকৃত বিষয়ের চাহিদার বিপরীত ও তা নষ্টকারী কাজ করে। (অর্থাৎ, এক রকম দাবি করে তার বিপরীত কাজ করলে তাকে বলা হয় "ইয়াযউমূনা")। এর প্রমাণ বহন করে আল্লাহর বাণী: ﴿وَقَدْ أُمِرُوٓاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِۦ﴾ অথচ তাদেরকে নির্দেশ হয়েছে, তাকে অস্বীকার করতে। *সূরা আন্ নিসা ৪:৬০।*

কারণ, ত্বগূতকে (আল্লাহ দ্রোহী শক্তিকে) অস্বীকার করা তাওহীদের অন্যতম রুকন। যেমনটি সূরা আল বাকারা এর ২৫৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে। যদি এ রুকন কোনো ব্যক্তির মাঝে না পাওয়া যায় তবে সে কোনো ক্রমেই তাওহীদপন্থি হতে পারে না। তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব হলো, ঈমানের মূল ভিত্তি যার দ্বারা সকল আমল বিশুদ্ধ হয়। আর আমল তাওহীদ ভিত্তিক না হলে উক্ত আমল গ্রহণীয় হবে না। আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে:

﴿فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

এখন যারা গোমরাহকারী ত্বগূতদেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙ্গার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন। *সূরা আল্ বাকারা ২:২৫৬।*

আর এটা এজন্য যে, ত্বগূতের নিকটে বিচারকার্য বা ফায়সালা চাওয়ার অর্থই হলো তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।[৪৮]

যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান মোতাবেক ফায়সালা করে না তার ঈমান না থাকা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর বিধান মোতাবেক বিচারকার্য পরিচালনা করা ঈমান, বিশ্বাস এবং আল্লাহর ইবাদত। এটাকে দীন হিসাবে গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। অতএব, আল্লাহর বিধানের প্রতি ঈমান না

---

[৪৮] ফতহুল মাজীদ ৪৬৭-৪৬৮ পৃষ্ঠা।

রেখে শুধু তা মানুষের জন্য অধিক উপযোগী ও নিরাপত্তার জন্য সর্বাধিক কার্যকর বলা ও সে অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করা জায়িয নয়।

অনেকে প্রথম বিষয়টিকে ভুলে গিয়ে দ্বিতীয় বিষয়টিকেই (অধিক উপযোগী ও নিরাপত্তা) বেশি গুরুত্ব দেয়। ইবাদতের বিশ্বাস ব্যতীত অধিক উপযোগী হওয়ার দরুন যারা আল্লাহর বিধান মোতাবেক ফায়সালা করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তিরস্কার করেছেন। তিনি বলেন:

﴿وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ إِذَا فَرِيقٞ مِّنۡهُم مُّعۡرِضُونَ ٤٨ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلۡحَقُّ يَأۡتُوٓاْ إِلَيۡهِ مُذۡعِنِينَ﴾

তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে আহবান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রসূলের কাছে ছুটে আসে। *সূরা আন নূর ২৪:৪৮-৪৯।*

এ সকল লোকেরা নিজেদের প্রবৃত্তি ব্যতীত অন্য কিছুকে গুরুত্ব দেয় না। কোনো বিষয় তাদের মনের বিপরীত হলে তা তারা প্রত্যাখ্যান করে। কারণ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে বিচার ফায়সালা চাওয়ার মাধ্যমে তারা ইবাদতের উদ্দেশ্য করে না।

মানব রচিত বিধান দিয়ে বিচার ফায়সালাকারীর বিধান

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾

যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের। *সূরা আল্ মায়িদা ৫:৪৪।*

উপরোক্ত আয়াতে এ ঘোষণাই দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত মানব রচিত বিধান দিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করা কুফরী। হাকিম বা বিচারকের অবস্থানুযায়ী কখনো এটা বড় কুফরী হতে পারে যা মানুষকে দীন ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আবার কখনো তা ছোট কুফরী হতে পারে যা মানুষকে দীন ইসলাম থেকে বের করে না। এটি নির্ভর করবে বিচারকের অবস্থার ওপর। যদি কোনো বিচারক বিশ্বাস করে যে,

(১) আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করা ফরয নয়,

(২) অথবা সে এ ব্যাপারে ইচ্ছাধীন,

(৩) অথবা আল্লাহর বিধানকে হেয় প্রতিপন্ন করে,

(৪) অথবা বিশ্বাস করে যে, মানব রচিত বিধান আল্লাহর বিধানের চেয়ে ভালো বা তার সমপর্যায়ের,

(৫) অথবা বিশ্বাস করে যে আল্লাহর বিধান বর্তমান সময়ের জন্য প্রযোজ্য নয়,

(৬) অথবা মানব রচিত বিধান দিয়ে বিচার ফায়সালা দ্বারা কাফির ও মুনাফিকদেরকে সন্তুষ্ট করতে চায় তবে এটা বড় কুফরী যার দ্বারা মানুষ ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বের হয়ে যায়।

অপর দিকে যদি কোনো বিচারক বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করা ফরয এবং বিচারাধীন মামলায় তার বিধান জেনেও নিজেকে শাস্তির যোগ্য স্বীকার করে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মানব রচিত বিধান দ্বারা বিচার কার্য পরিচালনা করে তবে এ বিচারক অবাধ্য, অপরাধী ও পাপী।

এ বিচারক ছোট কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার দরুন এক প্রকার কাফির। কিন্তু এ কুফরী তাকে ইসলাম থেকে পূর্ণ বের করে দেয় না। আর নিজের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি কোনো বিচারক চলমান মামলায় আল্লাহর বিধান জানতে অপারগ হয়ে বিচার ফায়সালা করতে গিয়ে ভুল করে বসেন তবে এ বিচারক ভুলকারী হওয়া সত্ত্বেও ইজতিহাদ বা প্রচেষ্টার দরুন সওয়াব পাবেন এবং তার ভুল মার্জনীয়।[৪৯]

এটা ব্যক্তিগত (ব্যক্তি বিশেষের) বিষয়ে বিচারের বিধান। কিন্তু জন সাধারণের ব্যাপক বিষয়ে বিচারের বিধান ভিন্ন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:[৫০] যে বিচারক দীনদার হওয়া সত্ত্বেও না জেনে বিচারকার্য পরিচালনা করবে সে জাহান্নামে যাবে। যদি কোনো বিচারক হক জানার পরও তার বিপরীত ফায়সালা দেয় তবে সেও জাহান্নামী।

---

[৪৯] শারহু আকীদা আত-তাহাবিয়া ৩৬৩-৩৬৪ পৃষ্ঠা।

[৫০] মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৫/৩৮৮।

যে বিচারক ইনসাফ ও জ্ঞান ব্যতীত বিচার ফায়সালা করে সে জাহান্নামী হওয়ার অধিক হকদার। আর তা ব্যক্তি বিশেষের বিচারকার্য পরিচালনার বিধান।

কিন্তু যদি কোনো বিচারক মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপক বিষয়ে বিচার করতে গিয়ে হককে বাতিল এবং বাতিলকে হক, সুন্নাতকে বিদআত এবং বিদআতকে সুন্নাত, ভালোকে মন্দ এবং মন্দকে ভালো বলে সিদ্ধান্ত দেয়,

অথবা আল্লাহ ও রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশকৃত কাজে বাধা দেয় এবং আল্লাহ ও রসূলের নিষেধকৃত কাজের আদেশ জারি করে তবে এবিচারকের বিষয়টি আলাদা।

বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক, রসূলগণের ইলাহ্, বিচার দিবসের মালিক, প্রথম ও শেষে একমাত্র প্রশংসার হকদার আল্লাহ তা'আলা তার ব্যাপারে ফায়সালা করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}

বিধান তারই এবং তোমরা তারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। *সূরা আল্ কাসাস ২৮: ৮৮।* অপর আয়াতে তিনি বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدٗا﴾

তিনিই তার রসূলকে হিদায়েত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠাতারূপে আল্লাহ যথেষ্ট। সূরা আল্ ফাত্হ ৪৮:২৮।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন: এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান মোতাবেক বিচার ফায়সালাকে ফরয বলে বিশ্বাস করে না সে কাফির। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের অনুসরণ ব্যতীত নিজের মতানুযায়ী মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালা করাকে বৈধ ও ইনসাফ ভিত্তিক মনে করে সেও কাফির। কারণ, প্রত্যেক জাতিই আদ্ল ও ন্যায় বিচার ফায়সালা করার আদেশ দেয়।

অনেক ধর্মের লোকদের নিকটে তাদের বিজ্ঞদের রচিত দেওয়া বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করাই আদ্ল বলে গণ্য। বরং নিজেকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্তকারী অনেক ব্যক্তিই আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে প্রচলিত বিধান দিয়ে বিচার ফায়সালা করে। যেমন, প্রাক গ্রাম্য বেদুঈনরা তাদের দলপতিদের

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা করতো। আর ঐ সকল দলপতি ও নেতারা তাদের মাঝে গ্রহণীয় ছিল। তারা মনে করতো কুরআন হাদীস বাদ দিয়ে আমাদের দলপতি বা নেতাদের মত অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করাই অধিক উপযোগী।

আর এটাই হলো কুফরী। অনেক লোকই ইসলাম মানা সত্ত্বেও নিজেদের অনুকরণীয় নেতাদের আদেশে প্রচলিত নিয়মে বিচার ফায়সালা করে।

এসকল লোকেরা যদি মানব রচিত বিধান দিয়ে বিচার কার্য পরিচালনা করা হারাম জানা সত্ত্বেও আল্লাহর বিধান না মানে বরং এর বিপরীত বিধান দ্বারা বিচার কার্য ও দেশ পরিচালনা করা হালাল (বৈধ) মনে করে তবে তারা কাফির)।[৫১]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: যদি কোনো বিচারক আল্লাহর বিধানকে সঠিক এবং নিজেকে অপরাধী জেনেও কোনো সময় আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মনগড়া মতবাদ দিয়ে বিচার ফায়সালা করে তবে সে কুফরে আসগার করবে। কিন্তু যারা ধারা অনুযায়ী আবশ্যকীয় নিয়ম নীতি তৈরী করে, তা নিশ্চিত বড় কুফরী।

আর যদি এসমস্ত লোকেরা বলে: শরীআতের বিধানাবলি অধিক ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক এবং আমরা ভুল করেছি তথাপিও তারা বড় কুফরী করার দরুন ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।[৫২]

শাইখ মুহাম্মাদ (রহিমাহুল্লাহ) খণ্ডকালীন সাময়িক বিধান এবং ব্যাপক এমন বিধান যা অধিকংশ বা সকল সময়ে নিয়ম-নীতি হিসাবে মানা হবে তার মাঝে পার্থক্য করেছেন।

পরিশেষে তিনি এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, এ প্রকার কুফরী যে কোনো ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বের করে দিবে। এটা একারণে যে, যে ব্যক্তি ইসলামী নিয়মকে এক দিকে সরিয়ে রেখে মানব রচিত বিধানকে তার স্থলে গ্রহণ করে তা প্রমাণ করে যে, উক্ত ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, মানব রচিত বিধান শরীআতের বিধান থেকে উত্তম ও অধিক উপযোগী। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা এমন কুফরী যা মানুষকে ইসলাম ধর্ম থেকে বের করে দেয় এবং ঐব্যক্তির তাওহীদ নষ্ট হয়ে যায়।

---

[৫১] মিনহাজুস্ সুন্নাহ্ আন্ নাবাবিয়্যাহ্।

[৫২] মাজমূ' ফাতাওয়া শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ১২/২৮০।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শরীআত প্রণয়ন এবং হালাল-হারাম নির্ধারণের দাবি করা

বান্দা তার যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগী, লেনদেন/আদান-প্রদান, তাদের মাঝের পারস্পরিক সম্পর্ক, নিজেদের মাঝে সৃষ্ট দ্বন্দ-কলহ নিরসন, মামলা-মোকাদ্দামা ইত্যাদি বিষয়ের বিচার কার্যে যে নীতি বা বিধান অনুসরণ করে চলবে তা প্রণয়নের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব একমাত্র মহান রব্বুল আলামীনেরই। যিনি মানবজাতির পরিচালক এবং সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾

শুনে রেখ, তারই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। *সূরা আল্ আ'রাফ ৭:৫৪।*

কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলাই বান্দার উপযোগী বিষয়াদি জানেন, বিধায় তিনিই মানুষের জন্য উক্ত বিধান প্রণয়ন করেন। আল্লাহ তা'আলা তার রুবূবীয়্যাহ্ বা প্রভূত্বের যোগ্যতা বলে বান্দার জন্য শরীআত ও বিধান প্রণয়ন করেন। মানব গোষ্ঠী যেহেতু আল্লাহরই বান্দা তাই তাদের উক্ত বিধান ও শরীআত মানা ফরয। এর যাবতীয় কল্যাণ বান্দাই ভোগ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾

তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর-যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। *সূরা আন্ নিসা ৪:৫৯।* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي﴾

তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর, তার ফায়সালা আল্লাহর কাছে সোপর্দ। ইনিই আল্লাহ আমার পালনকর্তা। *সূরা আশ্ শূরা ৪২:১০।*

বান্দাহর জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে শরীআত প্রবর্তক গ্রহণের বিষয়টিকে আল্লাহ নাকচ করে দিয়ে বলেন,

﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ﴾

তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? *সূরা আশ্ শূরা ৪২:২১।*

অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীআত ব্যতীত অন্য কোনো শরীআত (বিধান) গ্রহণ করবে সে আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করবে। আল্লাহ এবং তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ইবাদত শরীআত সম্মত করেননি তা নবাবিস্কৃত বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই পথভ্রষ্টতা।

এ প্রসঙ্গে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.

যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনের মধ্যে এমন নতুন কিছু সংযোজন করল যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তা পরিত্যাজ্য।[৫৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করল যা আমাদের দীনের মাঝে নেই তার ঐকাজ প্রত্যাখ্যাত।[৫৪]

রাজনৈতিক পর্যায় ও মানুষের মাঝে ফায়সালার ক্ষেত্রে আল্লাহ এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা শরীআত সম্মত করেননি তাহাই ত্বগূত (আল্লাহ দ্রোহী বিধান) ও জাহিলিয়াত (অজ্ঞতা) যুগের বিধান। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ﴾

তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফায়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফায়সালাকারী কে? সূরা আল্ মায়িদা ৫:৫০।

---

[৫৩] সহীহ বুখারী হা/২৬৯৭, আবূ দাউদ হা/৪৬০৬।

[৫৪] সহীহ মুসলিম হা/১৭১৮।

অনুরূপ হালাল-হারাম করারও একমাত্র মালিক হলেন মহান রব্বুল আলামীন। এক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক হওয়া কারো জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾

যেসব জন্তুর ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা গুনাহ। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্রত্যাদেশ করে-যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে। *সূরা আল্ আন আ'ম ৬:১২১।*

আল্লাহর হারামকৃত বিষয়কে হালাল করার ক্ষেত্রে শয়তান ও তার দোসরদের আনুগত্য করাকে আল্লাহ তা'আলা তার সাথে শিরক করা বলে উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে আল্লাহর হালালকৃত বস্তুকে হারাম এবং হারামকৃত বস্তুকে হালাল করার ক্ষেত্রে যে সকল লোক উলামা এবং নেতাদের আনুগত্য করবে তারা যেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকেই মাবূদ হিসাবে গ্রহণ করলো। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের এবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তারা তার শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র। *সূরা আত-তাওবা ৯:৩১।*

হাদীসে এসেছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত আয়াতটি (সদ্য খ্রিষ্টান হতে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী) আদী ইবনে হাতিম এর নিকটে পাঠ করলে তিনি বললেন: হে আল্লাহর রসূল, আমরা তো তাদের ইবাদত বা পূজা করতাম না। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এমনটি কি হয়নি যে, আল্লাহর হারামকৃত বিষয়কে তারা তোমাদের জন্য হালাল বলে ফতোওয়া দিলে তোমরা তা মেনে নিতে এবং আল্লাহর হালালকৃত বস্তুকে তারা হারাম বলে সিদ্ধান্ত দিলে তোমরা তা সাদরে গ্রহণ

করতে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তা আমরা করতাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এটাই হলো তাদের ইবাদত করা।[৫৫]

হালাল-হারামের ক্ষেত্রে আল্লাহকে বাদ দিয়ে উলামা ও নেতাদের আনুগত্য করলে নেতাদের ইবাদত এবং আল্লাহর সাথে শিরক করা হয়। আর এ হলো বড় শিরক যা কালিমায়ে তাওহীদ শাহাদাতু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর চাহিদার পরিপন্থি।[৫৬]

কালিমায়ে তাওহীদের অন্যতম চাহিদা হলো, হালাল-হারাম করার একচ্ছত্র অধিপতি হলেন মহান রব্বুল আলামীন। এই যদি হয় ঐ ব্যক্তির অবস্থা যে, জেনে শুনে হালাল-হারামের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের বিপরীতে এসকল আলিম-উলামা ও আবেদদের আনুগত্য করে। অথচ তারা সঠিক ইলম ও ধর্মের অধিক নিকটবর্তী। ইজতিহাদী বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারার কারণে তারা ভুলও করতে পারেন। তবে ভুল হলেও তারা সওয়াব পাবেন।

তাহলে যারা কাফির ও নাস্তিকদের রচিত বিধানের অনুসরণ করে তাদের অবস্থা কি হতে পারে? এই মানব রচিত বিধানগুলোকেই নামধারী কিছু মুসলিম ইসলামী দেশসমূহে আমদানী করে সে অনুযায়ী মানুষদের মাঝে ফায়সালা করছে? ফা লা-হাওলা অলা-কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি!! (আল্লাহ ব্যতীত ভালো কাজে তৌফীক দাতা এবং অসৎ কাজ হতে বাধা দানকারী কেই নেই)। অবশ্যই এসকল লোক আল্লাহকে বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে নিজেদের রব্ব বা মাবূদ হিসাবে গ্রহণ করেছে। কাফিররাই এরূপ নামধারী মুসলিমদের জন্য বিধান তৈরী করে, হারামকে হালাল করে এবং সে অনুযায়ী মানুষের মাঝে ফায়সালা করে।

---

[৫৫] হাসান: তিরমিযী ৩০৯৫, সুনানে বায়হাকী আল্ কুবরা ২০৩৫০-৫১।

[৫৬] ফতহুল মাজীদ ১০৭ পৃষ্ঠা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নাস্তিক্যবাদী ও জাহিলী দলের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করার বিধান

১। নাস্তিক্যবাদ: যেমন কম্যুনিজম-সমাজতন্ত্র, সেকুলারিজম-ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ, পুঁজিবাদ, জাতীয়তাবাদসহ অন্যান্য নাস্তিক্যবাদী কুফরী মতবাদের সাথে কোনো ব্যক্তি নিজেকে সম্পৃক্ত করলে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে যায়। এ সকল দলের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করলেও সে বড় মুনাফিক। কারণ, মুনাফিকরা বাহ্যিকভাবে নিজেদেরকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করলেও অভ্যন্তরীণভাবে তারা কাফেরদের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ﴾

আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র। সূরা আল্ বাকারা ২:১৪। অপর আয়াতে তিনি বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمۡ فَإِن كَانَ لَكُمۡ فَتۡحٞ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَكُن مَّعَكُمۡ وَإِن كَانَ لِلۡكَٰفِرِينَ نَصِيبٞ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَسۡتَحۡوِذۡ عَلَيۡكُمۡ وَنَمۡنَعۡكُم مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ فَٱللَّهُ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا﴾

এরা এমনি মুনাফেক যারা তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতীক্ষায় ওঁৎপেতে থাকে। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের যদি কোনো বিজয় অর্জিত হয়, তবে তারা বলে, আমরাও কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? পক্ষান্তরে কাফেরদের যদি আংশিক বিজয় হয়, তবে বলে, আমরা কি তোমাদেরকে ঘিরে রাখিনি এবং মুসলমানদের কবল থেকে রক্ষা করিনি? সুতরাং আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন মীমাংসা করবেন এবং কিছুতেই আল্লাহ কাফেরদেরকে মুসলমানদের ওপর বিজয় দান করবেন না। *সূরা আন্ নিসা ৪:১৪১।*

অতএব, এ সকল ধোকাবাজ মুনাফিকরা প্রত্যেকে দ্বি-মূখী নীতি অবলম্বন করে। এক নীতিতে মুমিনদের সাথে মিলিত হয় আর অপর নীতিতে তারা

তাদের নাস্তিক দোসরদের নিকটে ফিরে যায়। এদের রয়েছে দু'টি জিহ্বা। একটি দিয়ে বাহ্যিকভাবে সে মুসলমানদেরকে গ্রহণ করে, অপরটির দ্বারা তারা তাদের গোপন ইচ্ছা প্রকাশ করে। ঠিক যেমনটি আল্লাহর নিম্ন বাণীতে বর্ণিত:

﴿وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ﴾

আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা মুসলমানদের সাথে উপহাস করি মাত্র। *সূরা আল্ বাকারা ২:১৪।*

এরা সব সময় কুরআন সুন্নাহ থেকে দূরে থাকে। কুরআন সুন্নাহর অনুসারীদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ও তাদেরকে হীন চোখে দেখে। সামান্য পার্থিব জ্ঞানের অহংকারে তারা কুরআন-সুন্নাহর বিধান পালন করতে অস্বীকার করে। তাদের এ পার্থিব তুচ্ছ বিদ্যা তাদেরকে কেবল মন্দের দিকে ধাবিত করে। তাইতো তারা সর্বদা কুরআন সুন্নাহর অনুসারীদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ}

বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন। আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে। সূরা আল্ বাকারা ২:১৫।

আল্লাহ মুমিনদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ }

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। *সূরা আত তাওবা ৯:১১৯।*

নাস্তিক্যবাদী দলগুলো ধ্বংসাত্মক ও চরম ক্ষতিকর, কারণ তা মিথ্যা বা বাতিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজম আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করত আসমানী দীনসমূহের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে তা উৎখাতের জন্য চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি আকীদা বা বিশ্বাসহীন জীবন যাপনে সন্তুষ্ট এবং জ্ঞান দ্বারা সু-প্রমাণিত

মৌলিক সত্য ও নিশ্চিত বিষয়সমূহকে অস্বীকার করে সে স্বীয় জ্ঞানকে অকেজো করে নিজেকে পাগলে পরিণত করে।

আর সেক্যুলারিজম বা ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ সকল দীন বা ধর্মকে অস্বীকার করে এবং বস্তুবাদের ওপর (অর্থের ওপর) নিজেদের ভিত গড়তে চায় যার কোনো দিক নির্দেশনাকারী থাকে না। দুনিয়াতে জানোয়ারের মতো জীবন যাপন ছাড়া এদের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

অন্যদিকে পুঁজিবাদের চিন্তাধারা হলো হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধের তোয়াক্কা না করে যে কোনো উপায়ে অর্থ উপার্জন করা। দরিদ্র ও ফকীর-মিসকীনদের প্রতি তাদের কোনো দয়া-মায়া নেই। এদের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হলো আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী সুদ। এতে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যায়। সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি দারিদ্র জনগোষ্ঠীর রক্ত পর্যন্ত চুষে নেয়।

ঈমানদার তো দূরের কথা কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিই কি জ্ঞান, দীন-ধর্ম, জীবনের সঠিক কোনো উদ্দেশ্য ও অগ্রগতি ছাড়া এ সকল মতবাদের ওপর জীবন-যাপনে সন্তুষ্ট থাকতে পারে? আর তা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে পারে?

সঠিক দীনের অনুপস্থিতি, নষ্ট ঈমান-আকীদা এবং বিধর্মীদের অনুচর-অনুগত হয়ে জীবন যাপনের সুযোগে এ সকল ভ্রান্ত মতবাদ ইসলামী দেশসমূহে প্রবেশ করেছে।

২। জাহিলী যুগের কোনো মতবাদ, গণতন্ত্র, বর্ণবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার দিকে সম্পৃক্ত হওয়া আরেক প্রকার কুফরী ও ইসলাম ত্যাগকারী বিষয়। কারণ ইসলাম সকল প্রকার জাতীয়তাবাদ এবং জাহিলী মতবাদ ও প্রথাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَـٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَـٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ﴾

হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন। *সূরা আল্ আল হুজুরাত ৪৯:১৩।*

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ.

যে ব্যক্তি আসাবিয়্যাহর প্রতি আহ্বান জানায়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। যে আসাবিয়্যাহর জন্য যুদ্ধ করে, সেও আমাদের দলভুক্ত নয় এবং যে আসাবিয়্যাহ[৫৭] এর জন্য মারা যায় সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[৫৮]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন:

قَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ.

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহিলিয়াত যুগের অস্ত্রের ঝনঝনানি এবং পিতৃ মহলকে নিয়ে অহংকার করাকে দূরীভূত করেছেন। এখন মানুষ হতে পারে পরহেযগার মুমিন অথবা দূর্ভাগা পাপিষ্ট ব্যক্তি। মানুষ হলো আদম (আলাইহিস সালাম) এর সন্তান। আর আদম (আলাইহিস সালাম) মাটির তৈরী।[৫৯]

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ ----- إِلَّا بِالتَّقْوَى

আর তাকওয়া ব্যতীত কোনো অনারবের ওপর আরবীর কোনো মর্যাদা নেই। (আরব-অনারবের মাঝে মর্যাদার মানদন্ড হলো "তাকওয়া")।[৬০]

এইসব জাহিলী দলাদলী মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন এক জাতিতে পরিণত করেছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং সৎ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে বলেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন ও মতভেদ করতে নিষেধ করে ইরশাদ করেন:

---

[৫৭] গোত্র, বর্ণ, দেশ, আঞ্চলিকতা, জাতীয়তা ইত্যাদি কেন্দ্রিক সংকীর্ণতাকে আসাবিয়্যাহ বলা হয়

[৫৮] যঈফ: সুনানে আবূ দাউদ হা/৫১২১, ৫১২৩। তবে অর্থের দিক থেকে সহীহ। দেখুন: সহীহ মুসলিম হা/১৮৪৮, সহীহ: ইবনে মাজাহ হা/৩৯৪৮, নাসাঈ ফিল কুবরা হা/৩৫৬৬।

[৫৯] হাসান: তিরমিযী হা/৩৯৫৬।

[৬০] সহীহ: মুসনাদে আহমাদ হা/২৩৪৮৯।

﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنۡهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ﴾

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তার অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমুহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পার। *সূরা আলে ইমরান ৩:১০৩।*

আল্লাহ তা'আলা চান আমরা যেন একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর নাজাত প্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হই। পরিতাপের বিষয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ মুসলিম দেশগুলোর ওপর আগ্রাসন করার পর মুসলিম উম্মাহ্ এ সকল রক্তক্ষয়ী উগ্রবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং স্বদেশ প্রীতির নিকটে বশ্যতা স্বীকার করেছে।

সাথে এসকল বিষয়গুলোকে মুসলমানগণ ইলমী, প্রকৃত ও বাস্তব এমন বিষয় বলে মেনে নিয়েছে যেন তা থেকে বাঁচার কোনো বিকল্প পথ নেই। আশ্চর্য জনক হলেও সত্য, যে জাতীয়তাবাদ ও উগ্রবাদকে ইসলাম মিটিয়ে দিয়েছিল, আজ তা সঞ্জিবিত করার জন্য মুসলমানগণ দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। তারা জাতীয়তাবাদ ও উগ্রবাদকেই যথেষ্ট মনে করে এবং এর নিদর্শনসমূহকে পুনর্জীবিত ও ইসলামের ওপর এর আগ্রাসনের সময়কালকে নিয়ে গর্ব করে। এ ধারার নামধারী মুসলমানরাই আজ ইসলামকে জাহিলিয়াত বলে নাম করণের জন্য চাপ প্রয়োগ করে।

অথচ আল্লাহ তা'আলা এ জাহিলিয়াত থেকে বের হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে তাদেরকে এ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ে উৎসাহিত করেছেন।

মুমিনের উচিত অতীত জাহিলিয়াতের উল্লেখ না করা। যদি উল্লেখ করতেই হয় তবে ঘৃণা-অসন্তুষ্টি, অপছন্দ, গাত্রদাহ্ ও গা শিহরণসহ উল্লেখ করবে। আটকাবস্থায় কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত ও নির্যাতিত কয়েদী বা বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলে গাত্রদাহ্ ও শিহরণ ব্যতীত কি সে তার শাস্তির কথা উল্লেখ করতে

পারে? কঠিন ও দীর্ঘ মৃত্যুরোগ হতে মুক্তি লাভকারী ব্যক্তি কি তার অসুস্থতার দিনগুলো স্মরণ করতে গিয়ে হতবিহ্বল ও অবস্থা পরিবর্তন না হয়ে পারে?

এটা জানা আবশ্যক যে, এ সকল দলাদলী ও মতবাদ এমন আযাব-শাস্তি যা আল্লাহ তা'আলা তার শরীআত হতে বিমূখ ও বে-দীন ব্যক্তিদের প্রতি প্রেরণ করেছেন। যেমন -আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍۗ﴾

আপনি বলুন, তিনিই শক্তিমান যে, তোমাদের ওপর কোনো শাস্তি ওপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখী করে দিবেন এবং এককে অন্যের ওপর আক্রমনের স্বাদ আস্বাদন করাবেন। দেখ, আমি কেমন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলি বর্ণনা করি যাতে তারা বুঝে নেয়। *সূরা আল্ আনআ'ম ৬:৬৫।* রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ

ইমাম ও বিচারকরা যখন আল্লাহর কিতাব কুরআন অনুযায়ী ফায়সালা না করে এবং আল্লাহর বিধানকে প্রাধান্য না দেয় তখন তিনি তাদের পরস্পরের মাঝেই ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করে দেন।[৬১]

নিশ্চয় কোনো দলের জন্য উগ্রতা ও গোঁড়ামী পোষণ করা অন্যের নিকট হতে সত্য গ্রহণে বাধা দেয়। যেমন ইয়াহূদীদের অবস্থা যাদের ক্ষেত্রে-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنۢبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾

যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা পাঠিয়েছেন তা মেনে নাও, তখন তারা বলে, আমরা মানি যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। সেটি ছাড়া সবগুলোকে তারা অস্বীকার করে। অথচ এ গ্রন্থটি সত্য এবং সত্যায়ণ করে ঐ

---

[৬১] হাসান: সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০১৯।

গ্রন্থের যা তাদের কাছে রয়েছে। বলে দিন, তবে তোমরা ইতিপূর্বে পয়গম্বরদের হত্যা করতে কেন যদি তোমরা বিশ্বাসী ছিলে? সূরা আল্ বাকারা ২:৯১।

অনুরূপ জাহিলিয়াত যুগের লোকেরাও নিজেদের দাপ-দাদার মতের প্রতি গোঁড়ামীবশত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকটে যে সত্য নিয়ে এসেছিলেন তা তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَآ أَلۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ شَيۡـٔٗا وَلَا يَهۡتَدُونَ﴾

আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব। যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদি ও তাদের বাপ দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও। *সূরা আল্ বাকারা ২:১৭০।*

এ সব দলের অনুসারীরা নিজ নিজ দল ও দলের আদর্শকে ইসলামের বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ ইসলাম বিশ্ব মানবতার জন্য আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ।

নবম পরিচ্ছেদ

জীবন পরিচালনায় বস্তুবাদী চিন্তা-ধারা ও তার ক্ষতিকর দিকসমূহ

জীবন পরিচালনার দু'টি দর্শন রয়েছেঃ একটা হলো বস্তুবাদী দর্শন। অপরটি হলো সঠিক (ইসলামী) দৃষ্টিভঙ্গি। আর প্রত্যেকটি দর্শনের আলাদা প্রভাব রয়েছে।

ক। বস্তুবাদী জীবনদর্শনের অর্থ হলোঃ কেবলমাত্র পার্থিব চাহিদা, আনন্দ মিটানোতে মানুষের চিন্তা-ধারা সীমাবদ্ধ হওয়া এবং শুধু এজন্য তার কর্মকাণ্ড সীমিত থাকা। ফলে এর শেষ পরিণতি সম্পর্কে তার কোনো চিন্তাও হয় না এবং সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে তার জন্য সে কোনো কাজও করে না। সে একথাও জানে না যে, আল্লাহ পার্থিব জীবনকে পরকালের জন্য ক্ষেত্রভূমি

হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ দুনিয়াকে করেছেন কর্মস্থান এবং আখিরাত বা পরকালকে করেছেন প্রতিফল প্রাপ্তির স্থান।

অতএব, যে ব্যক্তি তার পার্থিব জীবনকে ভালো কাজে ব্যয় করবে সে উভয় জগতে লাভবান হবে। আর যে ব্যক্তি তার পার্থিব জীবনকে নষ্ট করবে তথা কুরআন- হাদীস বহির্ভূত পথে চলবে সে তার পরকালকে নষ্ট করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾

সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি। সূরা আল্ হাজ্জ ২২:১১।

অতএব আল্লাহ তা'আলা অনর্থক এ দুনিয়া সৃষ্টি করেননি। বরং তিনি মহৎ এক হিকমতের জন্য (বিশেষ উদ্দেশ্য) দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে **শ্রেষ্ঠ?** সূরা আল্ মুল্ক ২। অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا}

আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে পৃথিবীর জন্যে শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে। *সূরা আল্ কাহ্ফ ৭।*

এ দুনিয়াতে ক্ষণস্থায়ী আনন্দ সামগ্রী, সন্তান-সন্ততী, সহায় সম্পদ, মরিচিকা সদৃশ চাক্যচিক্যময়, সম্মান-মর্যাদা ও নেতৃত্ব এবং আরো আনন্দ দানকারী কত জিনিস যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তা তিনি ছাড়া কেউ জানেন না। অধিকাংশ মানুষ দুনিয়ার বাহ্যিক বিষয়ে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রেখে তার ফিৎনায় পতিত হয়ে এর দ্বারা আনন্দ উপভোগ করা শুরু করেছে। কিন্তু এ দুনিয়ার তাৎপর্য সম্পর্কে কোনো চিন্তাও করে না।

তাই এ প্রকার লোকেরা পরকাল বাদ দিয়ে দুনিয়া তথা অর্থ-সম্পদ উপার্জন এবং তা দ্বারা আনন্দ উপভোগে মত্ত রয়েছে। বরং অনেক সময় তারা মৃত্যু পরবর্তী জীবনকেই অস্বীকার করে। এদের ব্যাপারেই - আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَقَالُوٓاْ إِنۡ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنۡيَا وَمَا نَحۡنُ بِمَبۡعُوثِينَ﴾

তারা বলে: আমাদের এ পার্থিব জীবনই জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না। *সূরা আল্ আনআ'ম ৬:২৯।*

দুনিয়ার বিষয়ে যাদের এরূপ চিন্তাধারা তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত ওয়াদা দিয়ে বলেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرۡجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَٱطۡمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنۡ ءَايَٰتِنَا غَٰفِلُونَ ۝٧ أُوْلَٰٓئِكَ مَأۡوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ﴾

অবশ্যই যেসব লোক আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই উৎফুল্ল রয়েছে, তাতেই প্রশান্তি অনুভব করেছে এবং যারা আমার নির্দশনসমূহ সম্পর্কে বেখবর। এমন লোকদের ঠিকানা হল আগুন সেসবের বদলা হিসাবে যা তারা অর্জন করছিল। *সূরা ইউনুস ১০: ৭-৮।* অপর আয়াতে তিনি বলেন:

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيۡهِمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ فِيهَا وَهُمۡ فِيهَا لَا يُبۡخَسُونَ ۝١٥ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَٰطِلٞ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾

যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, হয় আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। এরাই হল সেসব লোক আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে; আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হল। *সূরা হূদ ১৫-১৬।*

উল্লিখিত চিন্তা-ধারায় বিশ্বাসী সবাইকেই এ শাস্তি দেওয়া হবে। আর তারাও এ শাস্তির সম্মুখীন হবে যারা পরকালীন নেক কাজ করে, কিন্তু তা দ্বারা দুনিয়া অর্জন করতে চায়, আর মুনাফিক এবং লোক দেখানো নেক আমলকারীরা, অপর দিকে পুনরুত্থান ও হিসাব দিবসে অবিশ্বাসী কাফিররা তো এ শাস্তি পাবেই। যেমন: জাহিলিয়াত বা অজ্ঞতা যুগের লোকদের অবস্থা।

সর্বনাশী মতবাদসমূহে যেমন: পূঁজিবাদ, কম্যুনিজম এবং নাস্তিক্যবাদী সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিশ্বাসীরাও আল্লাহর ওয়াদাকৃত শাস্তি পাবে। তারা জীবনের কোনো মর্যাদাই বুঝেনি। পার্থিব ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টি-

ভঙ্গি সামনে অগ্রসর হয়নি। বরং এরা চতুস্পদ জন্তু থেকেও অধিক পথভ্রষ্ট। কারণ এ সকল লোকেরা তাদের জ্ঞানকে অকেজো করত নিজেদের শক্তিকে রহিত করে দিয়েছে। তারা সময়কে এমন অনর্থক কাজে নষ্ট করেছে যাতে তাদের জন্য কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকেনি। তারা ভালো কাজ করে নিজেরা স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারেনি এবং পরকালের জন্য তারা কোনো আমলই করেনি।

চতুষ্পদ জন্তুর জন্য অপেক্ষমাণ কোনো প্রত্যাবর্তন স্থান (পরকাল) নেই। পশুর কোনো জ্ঞান নেই যা দ্বারা সে চিন্তা করবে। অথচ পূর্বোক্ত মানুষদের বিষয়টি চতুষ্পদ জন্তু থেকে ভিন্ন। কারণ, তাদের জন্য অপেক্ষমাণ প্রত্যাবর্তন স্থান (পরকালীন জীবন) রয়েছে এবং তাদের চিন্তা-ভাবনার জন্য জ্ঞানও দেওয়া হয়েছে। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেন,

﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾

আপনি কি মনে করেন যে তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তারা আরো পথভ্রান্ত। *সূরা আল্ ফুরকান ২৫:৪৪।*

কেবল মাত্র পার্থিব চিন্তা-ধারার লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা অজ্ঞ বলে আখ্যায়িত করে বলেন:

﴿وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝٦ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হয়ে গেছে। আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি খেলাফ করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না। *সূরা আর্ রূম ৩০:৬-৭।*

এ সকল লোকেরা আধুনিক আবিষ্কার ও কারিগরি শিল্পে দক্ষতার পরিচয় দিলেও মূলত তারা অজ্ঞ। জ্ঞানী বলে পরিচিতির যোগ্যতা তারা রাখে না। কারণ তাদের জ্ঞান দুনিয়ার বাহ্যিক বিষয়াবলিকে অতিক্রম করতে পারেনি। আর এটা নিশ্চিত অপূর্ণ জ্ঞান। এরূপ জ্ঞানের লোকেরা জ্ঞানীর মতো মর্যাদাপূর্ণ শব্দের যোগ্য নয়। তাই এদেরকে জ্ঞানী বলা যাবে না। বরং জ্ঞানী শব্দটির যোগ্য হলেন তারাই যারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং তাকে ভয় করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰٓؤُا۟ۗ﴾

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাকে ভয় করে। *সূরা ফাতির ৩৫:২৮।*

পৃথিবীতে বস্তুবাদী চিন্তা-ধারার আরো দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ কারুনের কথা উল্লেখ করেছেন। যাকে তিনি অঢেল সম্পদ দান করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ فِى زِينَتِهِۦۖ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَـٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَـٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾

অতঃপর কারুন জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, তারা বলল, হায়! কারুন যা প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদেরকে যদি তা দেয়া হত! নিশ্চয় সে বড় ভাগ্যবান। *সূরা আল্ কাসাস ২৮:৭৯।*

যাদের দুনিয়া অর্জনের প্রবল আকাংখা ছিল, তারাই কারুণের মত অর্থ সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করেছিল। মূলত অর্থনৈতিক চিন্তা ধারার বশীভূত হয়ে তারা এরূপ আশা করেছিল। যেমন, কাফির রাষ্ট্রসমুহের অর্থনৈতিক ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও উন্নতির বর্তমান অবস্থা। আর দুর্বল ঈমানের মুসলমানেরা কি-না তাদের দিকে বিস্ময় ও আত্মতুষ্টির দৃষ্টিতে তাকায়!

অথচ তারা একবার খেয়াল করে না যে, ওরা কাফির এবং তাদের জন্য ভয়ানক জঘন্য পরকাল অপেক্ষা করছে। এ ভুল দৃষ্টি-ভঙ্গির কারণে তারা নিজেদের অন্তরে কাফিরদেরকে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখে। ফলে এরা তাদের কু-চরিত্র এবং ঘৃণিত কৃষ্টি কাল্চারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

অথচ এরা (দুর্বল মুসলমানেরা) প্রচেষ্টা, শক্তি অর্জন, আধুনিক আবিষ্কার ও শিল্প-কারিগরীতে কাফিরদের অনুসরণ করে না। অথচ এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾

আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যা দ্বারা

তোমরা আল্লাহর শত্রুদেরকে এবং তোমাদের শত্রুদেরকে ভয় দেখাবে। *সূরা আল্ আন্‌ফাল ৮:৬০।*

খ। জীবনের দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিঃ এটা বিশুদ্ধ ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। বিশুদ্ধ ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো- মানুষ এ দুনিয়ার সম্পদ, নেতৃত্ব এবং অর্থনৈতিক শক্তিকে এমন মাধ্যম মনে করবে যা দ্বারা পরকালের কাজে সহযোগিতা নেওয়া হবে। অতএব প্রকৃত পক্ষে স্বয়ং দুনিয়া নিন্দনীয় নয়। তবে এই দুনিয়াতে বান্দার ভালোমন্দ কর্মের দরুণ তার প্রশংসা ও নিন্দা করা হবে। দুনিয়া হলো পরকালে মুক্তি বা নাজাতের সেতু ও পুল। দুনিয়াতে রয়েছে পরকালের পাথেয়। পরকালে জান্নাতীরা যে সুখময় জীবন লাভ করবেন তা দুনিয়াতে তাদের সৎ কর্মের কারণেই। তাই দুনিয়া হলো জিহাদ, সালাত, সিয়াম, আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় এবং কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগীতার ঘর। পরকালে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদেরকে বলবেনঃ

﴿كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيٓـَٔۢا بِمَآ أَسۡلَفۡتُمۡ فِي ٱلۡأَيَّامِ ٱلۡخَالِيَةِ﴾

বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, (অর্থাৎ দুনিয়াতে) তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে। সূরা আল্ হাককাহ ৬৯:২৪।

দশম পরিচ্ছেদ

ঝাড়-ফুঁক এবং তাবিজ-কবচ সম্পর্কে

ক। ঝাড়-ফুঁকঃ الرُّقَى শব্দের অর্থ ঝাড়-ফুঁক। আর্‌রুকা শব্দটি رُقية রুকিয়্যাতুন শব্দের বহুবচন।

রুকিয়্যাহ হলোঃ এমন সব রক্ষাকবচ যা দ্বারা রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করা হয়। যেমনঃ জ্বর, মৃগী রোগসহ অন্যান্য ব্যাধি ও বালা-মুসীবত। একে মানুষেরা আযায়িম বা দৃঢ় ইচ্ছা ও সঙ্কল্প বলে নাম করণ করেছে। এটা দু'প্রকারঃ

প্রথম প্রকারঃ শিরকমুক্ত ঝাড়-ফুঁক।

যেমনঃ রোগীর ওপর কুরআনের কিছু আয়াত পাঠ করা অথবা আল্লাহর নাম ও গুণাবলির দ্বারা আল্লাহর নিকটে রোগ মুক্তি চাওয়া। এ প্রকার ঝাড়-ফুঁক জায়েয। কারণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ঝাড়-ফুঁক করেছেন, এর আদেশ দিয়েছেন এবং একে জায়েয বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

আওফ ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ

كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ.

জাহিলিয়াত যুগে আমরা ঝাড়-ফুঁক করতাম। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমাদের ঝাড়-ফুঁকগুলো আমার সামনে পেশ করো। যে ঝাড়-ফুঁকে শিরক নেই তা করতে কোনো অসুবিধা নেই।[৬২]

ইমাম সুয়ূত্বী রহি বলেন: তিনটি শর্তের ভিত্তিতে ঝাড়-ফুঁক জায়িয বলে উলামাগণ (রহিমাহুমুল্লাহ) ঐকমত্য পোষণ করেছেন। শর্তগুলো হলো:

ক। ঝাড়-ফুঁক যেন আল্লাহর বাণী অথবা তার নাম ও গুণাবলি দ্বারা হয়।

খ। আরবী ভাষায় এবং এমন শব্দে হতে হবে যার অর্থ বুঝা যায় এবং

গ। এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, ঝাড়-ফুঁকের নিজস্ব কোনো প্রভাব নেই। বরং আরোগ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।[৬৩]

ঝাড়-ফুঁকের পদ্ধতি:

কুরআনের আয়াত অথবা দুআ পড়ে রোগীকে ফুঁক দিতে হবে। অথবা দুআ পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা রোগীকে পান করানো। যেমন, সাবিত ইবনে কাইস এর হাদীসে এসেছে:

ثُمَّ أَخَذَ تُرَابًا مِنْ بَطْحَانَ فَجَعَلَهُ فِي قَدَحٍ ثُمَّ نَفَثَ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَصَبَّهُ عَلَيْهِ.

অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুত্বহান নামক স্থানের কিছু মাটি নিয়ে একটা পাত্রে রেখে তাতে পানি মিশিয়ে ফুঁক দিলেন এবং তা সাবিত এর শরীরের ওপর ঢেলে দিলেন।[৬৪]

দ্বিতীয় প্রকার ঝাড়-ফুঁক: শিরকযুক্ত ঝাড়ফুঁক। এ প্রকার ঝাড়-ফুঁকে গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ব্যতীত অন্যের) সহযোগিতা নেওয়া হয়। গাইরুল্লাহর নিকটে প্রার্থনা, ফরিয়াদ ও আশ্রয় চাওয়া হয়। যেমন: জিন, ফেরেশতা,

---

[৬২] সহীহ মুসলিম হা/২২০০, সহীহ: আবূ দাউদ হা/৩৮৮৬।

[৬৩] ফাতহুল মাজীদ ১৩৫ পৃষ্ঠা।

[৬৪] যঈফ: আবূ দাউদ হা/৩৮৮৫।

নাবীগণ আলাইহিমুস্ সলাতু অস্সালাম এবং সৎ ব্যক্তিগণের নাম দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা। উল্লিখিত বিষয়গুলোতে গাইরুল্লাহকে আহ্বান করা হয় বিধায় তা শিরকে আকবার বা বড় শিরক। দ্বিতীয় প্রকার ঝাড়-ফুঁক অনেক সময় অনারবী ভাষা অথবা এমন শব্দাবলি দ্বারা করা হয় যার অর্থ বুঝা যায় না। এ প্রকার ঝাড়-ফুঁকে অজান্তে শিরক বা কুফরী প্রবেশের ভয় রয়েছে বিধায় তা নিষিদ্ধ।

খ। التمائم বা তাবিজ-কবচ: তামায়িম শব্দের অর্থ তাবিজ-কবচ। এটি تميمة তামীমাতুন শব্দের বহুবচন। এটা এমন জিনিস যা বদ নযর থেকে বাঁচার জন্য শিশুদের গলায় ঝুলানো হয়। কখনো তা বয়স্ক পুরুষ এবং নারীর গলায় লটকানো হয়। এটা দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার তাবিজ-কবচ: যা কুরআন দ্বারা করা হয়। এর পদ্ধতি হলো: একটি কাগজে কুরআনের কোনো আয়াত বা আল্লাহর নাম ও গুণাবলি লিখে রোগ মুক্তির আশায় গলায় ঝুলানো হয়। এ প্রকার তাবিজের ক্ষেত্রে আলিমগণ দু'টি মত পোষণ করেছেন।

প্রথম মত: এ প্রকার তাবিজ ঝুলানো জায়েয। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর্ ইবনে আস্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ মত পোষণ করেছেন। আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তার বাহ্যিকভাবও এ মতের পক্ষেই। আবূ জাফর আল্ বাকির এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) তার এক বর্ণনায় এমনই মত দিয়েছেন। আর যে সকল হাদীসে তাবিজ কবচ ব্যবহারে নিষেধ করা হয়েছে তা শিরক সম্বলিত বলে তারা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তাদের নিকটে শিরক সম্বলিত তাবিজ ব্যবহার করা জায়েয নয়। যে তাবিজে শিরক নেই তা ব্যবহারে কোনো অসুবিধা নেই এই হলো তাদের সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয় মত: তাবিজ-কবচ ব্যবহার করা নাজায়েয। এ সিদ্ধান্ত হলো: আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস, হুযাইফাহ, উকবাহ ইবনে আমির, ইবনে উকাইম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম), তাবিঈগণের একটি দল তাদের মধ্যে রয়েছেন: আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের সহচরবৃন্দ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) তার এক বর্ণনা মতে, (তার অনেক অনুসারী এ মতকে পছন্দ করেছেন) এবং পরবর্তী উলামাগণের। তারা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ.

ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবচ এবং যাদু-টোনা ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে শিরক।[৬৫]

তিওয়ালাহ (التولة): এটা এমন কিছু যাদু-মন্ত্র বা তাবিজ-কবচ যা স্বামীর হৃদয়ে স্ত্রীর এবং স্ত্রীর হৃদয়ে স্বামীর ভালোবাসা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তৈরী ও ব্যবহার করা হয়।

তিনটি কারণে দ্বিতীয় মতটি সঠিক ও বিশুদ্ধ:

১। তাবিজ-কবচ নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীসটি ব্যাপক। আর এ ব্যাপকতাকে নির্দিষ্ট করে এর বিপরীতে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি।

২। অবৈধ তাবিজ-কবচ চালু হওয়ার পথ বন্ধ করতে দ্বিতীয় মতটি বড় সহায়ক।

৩। কুরআন দ্বারা তাবিজ-কবচ করা হলে যে ব্যক্তি তা ঝুলায় সে পেশাব-পায়খানাসহ অন্যান্য নাপাক স্থানে তা বহন করার ফলে কুরআনের অবমাননা করে। অথচ কুরআনের অবমাননা করা হারাম।

দ্বিতীয় প্রকার তাবিজ-কবচ:

কুরআন ছাড়া অন্য কিছু মানুষের কোন অংগে ঝুলানো। যেমন: দানা জাতীয় পুঁতি বা তাবিজ, হাড়, কড়ি, সুতা, জুতা, লোহার কাঁটা, শয়তান-জিনদের নামসমূহ এবং বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্র। এরূপ তাবিজ-কবচ সম্পূর্ণ হারাম ও শিরক। কারণ, এ ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ তা'আলা তার নাম ও গুণাবলি এবং আয়াত ব্যতীত অন্যের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ.

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন কিছু (তাবিজ-কবচ ইত্যাদি) লটকায় তাকে ঐ বস্তুর দিকে সোপর্দ করে দেওয়া হয়।[৬৬]

অর্থাৎ সে যা লটকায় আল্লাহ তাকে সে বস্তুর নিকটে সোপর্দ করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করত তার নিকটে আশ্রয় নিয়ে নিজের সকল বিষয় তার দিকে সোপর্দ করে আল্লাহ তা'আলাই তার জন্য যথেষ্ট

[৬৫] সহীহ: ইবনে মাজাহ হা/৩৫৩০, আবূ দাউদ হা/৩৮৮৩।

[৬৬] হাসান: সুনানে তিরমিযী হা/২০৭২।

হবেন। সকল দূরবর্তী বিষয়কে তার কাছে করে দিবেন এবং কঠিন কাজকে তার জন্য সহজ সাধ্য করে দিবেন।

অপর দিকে যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন মাখলুক, তাবিজ-কবচ, ঔষধ ও কবরের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবে বা যোগাযোগ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ বস্তুর দিকে সোপর্দ করে দিবেন যা তার থেকে কোন কিছুকে বাধা দিতে পারবে না। ওটা তার কোন অপকার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না। ফলে এ ব্যক্তি তার আকীদা নষ্ট করত স্বীয় রব্বের সাথে সম্পর্কেচ্ছেদ করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে লাঞ্ছিত করবেন।

ঈমান-আকীদা নষ্টকারী ও তাতে ত্রুটি নিয়ে আসে এমন বিষয়াবলি থেকে স্বীয় আকীদা ও বিশ্বাসকে হিফাযত করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। তাই মুসলিম ব্যক্তি নাজায়িয কোন ঔষধ গ্রহণ করবে না। অপসংস্কৃতিতে বিশ্বাসী, ভেলকীবাজ গণকদের নিকটে রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার জন্য যাবে না।

কারণ, তারা তার হৃদয় ও আকীদাকে রোগাগ্রস্ত করে দিবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন।

কোন প্রকার শারীরিক ব্যাধি ছাড়াই অনেকে নিজের গায়ে এ সকল জিনিস ঝুলিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বদ নযর ও হিংসার ক্ষতির ভয় তাদের অন্তরে কাজ করে। অনেকে আবার এগুলো নিজের গাড়ি, বাহন, বাড়ীর দরজা অথবা দোকানে ঝুলিয়ে রাখে। এ সবই দুর্বল আকীদা (বিশ্বাস) ও আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা না করার পরিণাম। নিশ্চয় দুর্বল আকীদা বা বিশ্বাসই প্রকৃত রোগ বা ব্যাধি। তাওহীদ (আল্লাহর একত্ব) ও সঠিক আকীদা জানার মাধ্যমে এব্যাধির চিকিৎসা করা ফরয।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এবং আপনাদের সৎ আমলসমূহ কবুল করুন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা, সৃষ্টিজীবের দ্বারা ওসীলা, ফরিয়াদ এবং সাহায্য প্রার্থনা করার বিধান

ক। আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম/শপথ করার বিধান:

হাল্‌ফ্‌ (الحلف) শব্দটির প্রতিশব্দ হল ইয়ামীনুন (اليمين)। হাল্‌ফ্‌ বা ইয়ামীন শব্দদ্বয়ের শাব্দিক অর্থ: কসম করা, শপথ করা ও প্রতিজ্ঞা করা। ইসলামের পরিভাষায় হাল্‌ফ্‌ বা শপথ হলো: বিশেষভাবে কোন সম্মানিত ব্যক্তি বা বস্তুর নাম উল্লেখ করে কোন বিষয়কে সুদৃঢ় বা মজবুত করা। আর সম্মান পাওয়া আল্লাহর অধিকার। অতএব আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করা জায়েয নয়। আলেমগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, একমাত্র আল্লাহ এবং তার নাম ও গুণাবলির দ্বারাই শপথ করতে হবে। তারা এ ব্যাপারেও একমত পোষণ করেছেন যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা যাবে না।[৬৭] আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা শিরক। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ.

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করে সে কুফরী এবং শিরক করে।[৬৮]

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা শিরকে আসগার বা ছোট শিরক। কিন্তু শপথকারীর নিকটে শপথকৃত জিনিস যদি এমন সম্মানের পর্যায়ে পৌঁছে যায় যাতে তার ইবাদত করা হয় তবে তা শিরকে আকবার বা বড় শিরকে পরিণত হয়। যেমন: বর্তমান কবর পূজারীদের অবস্থা।

এরা মাযারস্থ ব্যক্তিকে আল্লাহর চেয়ে বেশি ভয় পায় ও অধিক সম্মান করে। এদের কাউকে তাদের পীর ও ওলীর নামে শপথ চাওয়া হলে সত্য ব্যতীত শপথ করে না। অপর দিকে আল্লাহর নামে শপথ চাওয়া হলে মিথ্যা হলেও শপথ করতে দ্বিধা করে না!!!

---

[৬৭] কিতাবুত্তাহীদের ওপর ইবনে কাসেম প্রদত্ত টিকা ৩০৩ পৃষ্ঠা।

[৬৮] সহীহ: তিরমিযী হা/১৫৩৫, মুসনাদে আহমাদ হা/৬০৭২, বাইহাকী সুনানুন কুবরা হা/১৯৮২৯, আবূ দাউদ হা/৩২৫১, ইবনে হিব্বান হা/৪৩৫৮।

অতএব, কসম বা শপথ হলো শপথকৃত ব্যক্তি বা বস্তুকে এমন সম্মান করা যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। সঙ্গত কারণেই শপথ বিষয়টিকে সম্মান প্রদর্শন করত যখন তখন বা কথায় কথায় বেশি শপথ করা উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ}

যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। *সূরা আল কলাম ৬৮:১০।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} আর তোমরা স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা করো। সূরা আল্ মায়িদা ৫:৮৯।

অর্থাৎ প্রয়োজন এবং সত্য নেকীর কাজ ব্যতীত তোমরা শপথ করবে না। কারণ অতিরিক্ত ও মিথ্যা শপথ করা আল্লাহকে অবজ্ঞা ও অসম্মান করার পরিচায়ক। তা তাওহীদ বা একত্বের পূর্ণতার পরিপন্থি। হাদীসে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أُشَيْمِطٌ زَانٍ , وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ , وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهَ لَهُ بِضَاعَةً فَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ وَلَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ.

কিয়ামতের দিন তিন প্রকার লোকের সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তারা হলো: বৃদ্ধ ব্যভিচারী, অহঙ্কারী ভিক্ষুক এবং ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহকে তার পণ্য বানিয়ে নিয়েছে; ফলে এ ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম ব্যতীত স্বীয় পণ্য ক্রয় বিক্রয় করে না।[৬৯]

অত্র হাদীসে অধিক শপথ করার ক্ষেত্রে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এটা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর নামের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থে অধিক শপথ করা হারাম। এমনি আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করাও হারাম।

মিথ্যা শপথকে ইয়ামিনে গামূস বলা হয়। তা হলো: অতীত কোন বিষয়ে জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করা। আর তা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: মুনাফিকরা জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করে। পূর্বের আলোচনার সারাংশ হল:

---

[৬৯] সনদ সহীহ: আল মু'জামুস্ সাগীর-লিত তাবারানী হা/৮২১, সহীহ মুসলিম হা/১০৭, সহীহ জামি' হা/৩০৭২, সহীহ তারগিব ওয়াত তারহিব হা/১৭৮৮।

১। গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে) নামে কসম/শপথ করা হারাম। যেমন: আমানত, কাবা শরীফ এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামে শপথ করা। গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা শিরক।

২। ইচ্ছা করে আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করা হারাম। এটাকে ইয়ামিনে গামুস বলা হয়।

৩। সত্য হলেও বিনা প্রয়োজনে আল্লাহর নামে অধিক শপথ করা হারাম। এতে আল্লাহ তা'আলাকে অবজ্ঞা ও অসম্মান করা হয়।

৪। প্রয়োজনের সময় আল্লাহর নামে সত্য শপথ করা জায়েয।

খ। সৃষ্টির ওসীলা (মাধ্যম) ধরে আল্লাহকে পাওয়ার চেষ্টা করা

তাওয়াসসুল (**التّوسّل**): কোন বস্তুর নিকটবর্তী হওয়া এবং তার নিকটে পৌঁছা। ওসীলা (**الوسيلة**) অর্থ: নৈকট্য অর্জন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ}

তোমরা তার (আল্লাহর) নিকটে ওসীলা সন্ধান কর। সূরা আল মায়িদা ৫:৩৫।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও সন্তুষ্টিমূলক কাজের মাধ্যমে তার নৈকট্য অর্জন করা।

তাওয়াস্সুল (التّوسّل) দু'প্রকার:

প্রথম প্রকার: শরীআত সম্মত তাওয়াস্সুল। এটাও কয়েকভাগে বিভক্ত, যথা:

১। আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলির দ্বারা তার ওসীলা বা নৈকট্য অর্জন করা। যেমন: আল্লাহ তা'আলা তার বাণীতে নির্দেশ দিয়ে বলেন:

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَٰٓئِهِۦۚ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴾

আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তার নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে। *সূরা আল্ আরাফ ৭:১৮০।*

২। ঈমান ও সৎ আমলের মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ করা। যেমন, ঈমানদারদের ওসীলা অর্জনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا يُنَادِي لِلۡإِيمَٰنِ أَنۡ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمۡ فَـَٔامَنَّاۚ رَبَّنَا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرۡ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلۡأَبۡرَارِ﴾

হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহবানকারীকে ঈমানের প্রতি আহবান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন। অতঃপর আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতএব আমাদের সকল গুনাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষত্রুটি দুর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে। *সূরা আলে ইমরান ৩:১৯৩।*

এক্ষেত্রে আরো প্রমাণ হলো হাদীসে বর্ণিত ঐ তিন ব্যক্তির ঘটনা যারা গুহায় আটকা পড়েছিলেন। ওপর থেকে পাথর পড়ার কারণে তারা যে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তার মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ফলে তারা বের হতে পারছিলেন না। তখন তারা নিজেদের সৎ কর্মসমূহের দ্বারা আল্লাহর নিকটে ওসীলা করলে আল্লাহ তা'আলা তাদের বিপদ দূর করলেন। আর তারা বের হয়ে নিজ নিজ কাজে গমন করেন।[৭০]

৩। আল্লাহর তাওহীদ বা একত্বের মাধ্যমে তার ওসীলা বা নৈকট্য অর্জন করা। যেমনঃ ইউনুস (আলাইহিস সালাম) তাওহীদকে ওসীলা করেছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা ইউনুস (আলাইহিস সালাম) এর কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

{فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ}

অতঃপর তিনি (ইউনুস (আলাইহিস সালাম)) অন্ধকারের মধ্যে আহবান করলেনঃ তুমি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র। *সূরা আল্ আম্বিয়া ২১:৮৭।*

৪। স্বীয় দুর্বলতা, প্রয়োজন ও দারিদ্রতা প্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে ওসীলা করা। যেমনঃ আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন,

{أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ}

[৭০] সহীহ বুখারী হা/২২১৫, ২২৭২, ২৩৩৩, ২৪৬৫, ৫৯৭৪, ও সহীহ মুসলিম হা/২৭৪৩।

আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি, আর আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। *সূরা আল্ আম্বিয়া ২১:৮৩।*

৫। জীবিত সৎ ব্যক্তিদের দুআর মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে ওসীলা করা। যেমন: সাহাবাগণের যুগে যখন অনাবৃষ্টি হতো তখন তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নিজেদের জন্য আল্লাহর নিকটে দুআ করতে বলতেন। তিনি মৃত্যুবরণ করলে সাহাবাগণ তার চাচা আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে নিজেদের জন্য আল্লাহর নিকটে দুআ করতে বললে তিনি তাদের জন্য দুআ করতেন।[৭১]

৬। নিজের গুনাহ ও পাপের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে ওসীলা করা। যেমন: মূসা আলাইহিস সালাম এর ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

{قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي}

হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের ওপর যুলুম করে ফেলেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন। *সূরা আল কাসাস ২৮:১৬।*

দ্বিতীয় প্রকার ওসীলা: শরীআত বহির্ভূত তাওয়াস্‌সুল। তা হলো উল্লিখিত শরীআতসম্মত ওসীলা ব্যতীত বাকী সকল ওসীলা। যেমন: মৃত ব্যক্তিদের নিকটে প্রার্থনা ও শাফা'আত তলবের মাধ্যমে ওসীলা করা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মান ও মর্যাদার দ্বারা ওসীলা করা। সৃষ্টির যাত অথবা অধিকারের দ্বারা ওসীলা করা। নিম্নে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করা হলো:

১। মৃত ব্যক্তিদের নিকটে দুআ চাওয়া অবৈধ: কারণ মৃত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় যেমন দুআ করতে সক্ষম, মৃত্যুর পর তিনি সে রকম দুআ করতে সক্ষম নন। একইভাবে মৃত ব্যক্তিদের নিকটে শাফাআত (সুপারিশ) চাওয়া অবৈধ। কারণ উমার ইবনে খাত্তাব, মুয়াবিয়াহ ইবনে আবূ সুফিয়ান ও তাদের সময়ে উপস্থিত সাহাবাগণ এবং তাদের সঠিকভাবে অনুসরণকারী তাবিয়ীগণ যখন অনাবৃষ্টির শিকার হতেন তখন তারা জীবিত ব্যক্তি, যেমন- আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং ইয়াযীদ ইবনে আসওয়াদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর মাধ্যমেই আল্লাহর নিকটে বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন, ওসীলা ধরতেন এবং সুপারিশ তলব করতেন।

কখনই তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবরের নিকটে বা অন্য স্থানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা

---

[৭১] সহীহ বুখারী হা/১০১৪, সহীহ মুসলিম হা/৮৯৭।

করেননি। বরং এর পরিবর্তে তারা আব্বাস ও ইয়াযীদ ইবনে আসওয়াদ থেকে মাধ্যম গ্রহণ করতেন। উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ বলে দুআ করেছিলেন:

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ.

হে আল্লাহ, আপনার নাবীর জীবদ্দশায় আমরা আপনার নাবীর মাধ্যমে আপনার নিকটে ওসীলাহ গ্রহণ করলে আপনি আমাদিগকে বৃষ্টি দিতেন। এখন তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন তাই আমরা আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচার মাধ্যমে আপনার নিকটে ওসীলা করছি। অতএব, আপনি আমাদিগকে বৃষ্টি দান করুন। বর্ণনাকারী বলেন: তখন তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে বৃষ্টি লাভ করতেন।[৭২]

সাহাবাগণ যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে শরীআত সম্মত উপায়ে ওসীলা গ্রহণে অসুবিধার সম্মুখীন হলেন তখন তার পরিবর্তে তারা আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বা অন্য সাহাবীর মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করতেন। অথচ মৃত ব্যক্তির মাধ্যমে ওসীলা করা যদি জায়িয হতো তবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবরের নিকটে এসে ওসীলা করা তাদের জন্য খুবই সহজ ছিল।[৭৩]

সুতরাং তাদের সেটা পরিত্যাগ করা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, দুআ প্রার্থনা এবং সুপারিশ চাওয়াসহ সকল ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তিদেরকে ওসীলা করা জায়িয নয়। মৃত ব্যক্তিদের জীবদ্দশা ও মৃত্যুর পর উভয় অবস্থায় যদি তাদের দ্বারা দুআ ও সুপারিশ চাওয়া সমান হতো তবে সাহাবাগণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাদ দিয়ে তার চেয়ে কম মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির নিকটে যেতেন না।

২। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা অন্য কারো সম্মানের ওসীলা করা নাজায়িয। অনেকে নিম্নোক্ত হাদীসটি বলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মান বা মর্যাদার দ্বারা ওসীলা করা জায়িয বলে সাব্যস্ত করেন:

إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم.

---

[৭২] সহীহ বুখারী হা/১০১০।

[৭৩] মাজমূ' ফতোওয়া ১/৩১৮-৩১৯।

তোমরা যখন আল্লাহর নিকটে কোন কিছু চাইবে তখন আমার সম্মান ও মর্যাদার ওসীলা করে চাও। কারণ আল্লাহর নিকটে আমার মর্যাদা মহান।[৭৪]

অথচ উপরোক্ত হাদীসটি মিথ্যা ও জাল। মুসলমানদের নির্ভরযোগ্য কোন কিতাবে তা নেই। কোন হাদীস বিশারদ ও বিশেষজ্ঞ তা উল্লেখ করেননি।[৭৫] যেহেতু দলীল হিসাবে উপরোক্ত হাদীসটি সঠিক নয়, (আর অন্য কোন সহীহ দলীলও নেই)। তাই রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মান ও মর্যাদার ওসীলা করা জায়িয নয়। কারণ ইবাদতের কোন বিষয় স্পষ্ট দলীল ব্যতীত সাব্যস্ত হয় না।

৩। সৃষ্টির দোহাই দিয়ে ওসীলা করা অবৈধ। কারণ আরবী "বা" অব্যয়টি শপথের জন্য ব্যবহৃত হলে এ দ্বারা আল্লাহর ওপর শপথ করা বুঝায়। এক সৃষ্টির দ্বারা অপর সৃষ্টির ওপর শপথ করা অবৈধ। কারণ হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী তা শিরক। তাহলে সৃষ্টির দ্বারা কিভাবে আল্লাহর ওপর শপথ করা জায়েয হতে পারে? আর যদি আরবী "বা" অব্যয়টি সাবাবিয়াহ্ বা কারণ হিসাবে ব্যবহার হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির দ্বারা চাওয়াকে দুআ কবুলের কারণ করেননি এবং তার বান্দাদের জন্য এটা শরীআত সম্মতও করেননি।

৪। সৃষ্টির কোন অধিকারের দোহাই দিয়ে ওসীলা করা দু'টি কারণে নাজায়েয।

[ক] আল্লাহর ওপর কারো কোন অধিকার ওয়াজিব নয়। বরং আল্লাহ তা'আলাই নিজের ওপর বান্দার জন্য কিছু অধিকার নির্ধারণ করে তার ওপর অনুগ্রহ ও দয়া করেছেন। যেমনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾

মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। সূরা আর রূম ৩০:৪৭।

আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দা তার নিকটে ভালো প্রতিদান লাভের অধিকার রাখে। তবে তার এ অধিকার দয়া ও অনুগ্রহ লাভের অধিকার। এটা ঐরূপ অধিকার নয় যেমন কোন জিনিসের বিনিময়ে এক সৃষ্টির ওপর অন্য সৃষ্টির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বরং আল্লাহ তার আনুগত্যশীল ও মুমিন বান্দাদেরকে যে পুরস্কার দিবেন সেটা তার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও দয়া স্বরূপ।

---

[৭৪] তাওয়াস্ সুল লিশ্ শাইখ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) ১১৭ পৃষ্ঠা।

[৭৫] মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/৩১৯।

[খ] এই অধিকারের মাধ্যমে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের ওপর অনুগ্রহ ও দয়া করেন। এটা কেবল তার সাথেই নির্দিষ্ট। এর সাথে অন্য কারো কোন সম্পর্ক নেই। যখন কোন অধিকারহীন ব্যক্তি এর দ্বারা ওসীলা করবে তখন সে এমন অপরিচিত বিষয়ের মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণকারী বলে গণ্য হবে যার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। ফলে এ ওসীলা দ্বারা সে কোন কিছুই পাবে না। أسألك بحق السائلين. আমি যাঞ্ছাকারীদের অধিকারের মাধ্যমে চাইতেছি বলে যে হাদীসটি বর্ণনা করা হয় তা সহীহ নয়। কারণ, এ হাদীসের সনদে "আত্বীয়্যাহ্ আল্ আওফী" রয়েছেন। তিনি দুর্বল। অনেক মুহাদ্দিস তার দুর্বলতার ক্ষেত্রে সকলের ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। অতএব, যার অবস্থা এই তার বর্ণিত হাদীস দ্বারা আকীদার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দলীল পেশ করা গ্রহণীয় হবে না। তাছাড়া এতে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির মাধ্যমে ওসীলা করা হয়নি। বরং সকল প্রার্থনাকারীদের অধিকারের দ্বারা ওসীলা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদানুযায়ী প্রার্থনাকারীদের অধিকার হলো তাদের প্রার্থনা কবুল করা। এটা এমন এক অধিকার যা প্রার্থনাকারীদের জন্য আল্লাহ নিজেই নিজের ওপর ওয়াজিব করেছেন। অন্য কেউ তার ওপর এটা ওয়াজিব করেনি। আর এটা আল্লাহর সত্য ওয়াদা বা অঙ্গিকারের মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ। সৃষ্টিজগতের অধিকারের মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ নয়।

গ। সৃষ্টির নিকটে সাহায্য প্রার্থনা ও বিপদে উদ্ধার কামনা করা

আল্ ইসতিআনাহ (الاستعانة): যার অর্থ কোন বিষয়ে সাহায্য, সহযোগিতা ও শক্তি প্রার্থনা করা। আল্ ইস্তিগাসাহ (الاستغاثة): যার অর্থ বিপদে উদ্ধার কামনা করা বা কোন সমস্যা দূরিকরণে ফরিয়াদ করা। সৃষ্টির নিকট ফরিয়াদ কামনা ও সাহায্য প্রার্থনা করা দু'প্রকার।

প্রথম প্রকার: সৃষ্টিজগতের কেউ যে কাজ করতে সক্ষম সে কাজে তার সাহায্য চাওয়া এবং উদ্ধার কামনা করা বৈধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ﴾

সৎকর্ম ও তাকওয়ায় একে অন্যের সাহায্য কর। *সূরা আল্ মায়িদা ৫:২।*

মূসা আলাইহিস সালাম এর ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَٱسۡتَغَٰثَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِي مِنۡ عَدُوِّهِۦ﴾

অতঃপর যে তার নিজ দলের সে তার শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। *সূরা আল কাসাস ২৮:১৫।* এর আরো উদাহরণ হলো, যুদ্ধ ও অন্যান্য সময়ে মানুষ যা করতে সক্ষম সে বিষয়ে তার সাহায্য চাওয়া।

দ্বিতীয় প্রকার: যে কাজ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ করতে সক্ষম নয় সে কাজে সৃষ্টিজীবের নিকটে সাহায্য চাওয়া ও ফরিয়াদ জানানো। যেমন: যে কাজ আল্লাহ ব্যতীত কেউ করতে সক্ষম নয় সে বিষয়ে মৃত এবং জীবিত ব্যক্তিদের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা ও ফরিয়াদ জানানো। এর অন্যতম হলো: গাইরুল্লাহর নিকটে রোগীদের রোগ মুক্তি কামনা করা, মহা বিপদ-আপদ ও ক্ষতিকারক জিনিস প্রতিহত করার আবেদন জানানো। শিরকে আকবার (বড় শিরক) হওয়ার দরুন সৃষ্টিজীবের নিকট এ প্রকার সাহায্য প্রার্থনা করা ও ফরিয়াদ জানানো অবৈধ। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে এক মুনাফিক ছিল, যে মুমিনগণকে কষ্ট দিত। তাদের কতেকে বললেন: চলুন আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে এ মুনাফিকের কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য ফরিয়াদ জানাই। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

إنه لا يُستغاثُ بي، وإنما يستغاث بالله.

আমার নিকটে ফরিয়াদ জানানো যাবে না। কেবল মাত্র আল্লাহর নিকটেই উদ্ধার কামনা করতে হবে।[৭৬]

নিজের জীবদ্দশায় সামর্থিত বিষয়ে ফরিয়াদ শব্দটি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করাকে অপছন্দ করেছেন। কারণ, তার উদ্দেশ্য ছিল তাওহীদের সংরক্ষণ ও শিরকের যাবতীয় পথ বন্ধ করে দেয়া। স্বীয় স্রষ্টার ক্ষেত্রে শিষ্টাচার ও বিনয় শিক্ষা দেয়া এবং কথা ও কাজে সকল প্রকার শিরক থেকে উম্মাতকে সতর্ক করা। স্বীয় জীবদ্দশায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামর্থিত বিষয়ে ফরিয়াদ জানানোর অবস্থা এমন হলে কিভাবে মৃত্যুর পর তার নিকটে ফরিয়াদ জানানো এবং সাহায্য প্রার্থনা করা জায়িয হতে পারে যা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ করতে সক্ষম নয়।[৭৭] রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষেত্রে তা জায়িয না হলে অন্যের ক্ষেত্রে তা বৈধ হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

---

[৭৬] তাবারানী।

[৭৭] ফাত্হুল মাজীদ ১৯৬-১৯৭ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবারবর্গ এবং সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে যে আকীদা-বিশ্বাস রাখা আবশ্যক।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা এবং সম্মান করা ওয়াজিব। তার প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়া-বাড়ি ও সীমালজ্ঘন করা নিষিদ্ধ এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মর্যাদা।

১। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা এবং সম্মান করা ওয়াজিব। প্রত্যেক বান্দার ওপর সর্ব প্রথম ওয়াজিব হলো আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসা। এটা সবচেয়ে বড় ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾

আর যারা মু'মিন তারা আল্লাহকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। *সূরা আল বাকারা ২:১৬৫।*

কারণ, আল্লাহ তা'আলা হলেন এমন রব্ব যিনি স্বীয় বান্দাদের ওপর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকার নিয়ামত দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহর ভালোবাসার পর তার রসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেশি ভালোবাসা আবশ্যক। কারণ, তিনিই মানুষদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন, আল্লাহর পরিচয় মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন, তার শরীআতকে সকলের নিকটে পৌঁছিয়ে দিয়ে দীনের বিধিবিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। ফলে দুনিয়া ও আখিরাতের যে সকল কল্যাণ মুমিনগণ অর্জন করেছেন তা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য ও অনুসরণ ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.

যে ব্যক্তির মাঝে তিনটি বিষয় থাকবে সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে: আল্লাহ এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট অন্য সকলের চেয়ে প্রিয় হবে। কেবল মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে

কোন ব্যক্তিকে ভালোবাসবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে কুফরী থেকে বাঁচানোর পরে পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে সে অগ্নিতে নিক্ষেপের মত অপছন্দ করবে।[৭৮]

সুতরাং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসার অধীন। অর্থাৎ আল্লাহকে ভালোবাসতে চাইলে অবশ্যই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভালোবাসতে হবে। আল্লাহর ভালোবাসার পরই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালোবাসার স্থান। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বতন্ত্রভাবে ভালোবাসা এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য সকল প্রিয় ব্যক্তি ও বস্তুর ওপর তার ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার দেয়া আবশ্যক। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

তোমাদের কেউ আমাকে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততী এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি ভালো না বাসা পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না।[৭৯]

সত্যিকার অর্থে, প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির নিজের জীবনের চেয়েও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অধিক ভালোবাসা ওয়াজিব। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ.

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি আমার নিকটে আমার জীবন ব্যতীত সকল বস্তু থেকে প্রিয়। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: না, সেই আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আমাকে তোমার জীবনের চেয়েও অধিক ভালো না বাসা পর্যন্ত তুমি পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না। তখন উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: এখন আপনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আমার জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এখন তোমার ঈমান পূর্ণতা লাভ করল হে উমার।[৮০]

---

[৭৮] সহীহ বুখারী হা/১৬, সহীহ মুসলিম হা/৪৩।

[৭৯] সহীহ বুখারী হা/১৫, সুনানে দারিমী হা/২৭৮৩, মুসনাদে আহমাদ হা/১২৮১৪।

[৮০] সহীহ বুখারী হা/৬৬৩২।

সুতরাং বুঝা গেল যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভালোবাসা এবং তার ভালোবাসাকে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সকলের ভালোবাসার ওপর প্রাধান্য দেওয়া ওয়াজিব। কারণ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসার অধীন এবং তার আবশ্যককারী। অর্থাৎ কেউ আল্লাহর ভালোবাসার দাবি করলে অবশ্যই তাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেও ভালোবাসতে হবে। কেননা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা আল্লাহর রাস্তায় এবং তার সন্তুষ্টির জন্য। মুমিনের হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা বৃদ্ধি ও ঘাটতি হওয়ার সাথে সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি তার ভালোবাসা বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয়ে থাকে। প্রত্যেক আল্লাহ তা'আলা প্রেমিক তার রাস্তায় এবং তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অন্যকে ভালোবাসে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালোবাসার চাহিদা হলো: তাকে সম্মান করা, তাকে শ্রদ্ধা করা, তার আনুগত্য করা, তার কথাকে সকল সৃষ্টিজীবের কথার ওপর অগ্রাধিকার দেয়া এবং তার সুন্নাতকে সম্মান করা।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: কোন মানুষকে তখনি ভালোবাসা জায়িয হবে যখন তা আল্লাহর ভালোবাসার ও সম্মানের পরে এবং অধীনে হবে। যেমন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা এবং তাকে সম্মান করা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করা আল্লাহকে পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা করার পরিচায়ক। কারণ, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসেন এবং সমীহ করেন বলেই তার উম্মাত তাকে ভালোবাসেন এবং সম্মান করেন। অতএব, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা মানে আল্লাহকেই ভালোবাসা এবং আল্লাহকে ভালোবাসতে হলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভালোবাসা ওয়াজিব। সার কথা হলো: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি আল্লাহ তা'আলা এমন সম্মান-মর্যাদা এবং ভালোবাসা প্রদান করেছিলেন যা অন্য কাউকে প্রদান করেননি। এজন্য তার সাহাবাগণের হৃদয়ে তার প্রতি যে মর্যাদা-সম্মান ও ভালোবাসা ছিল অন্য কারো নিকটে কোন ব্যক্তি সে রকম সম্মান ও ভালোবাসার পাত্র ছিল না।

আম্‌র ইবনে আস্‌ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইসলাম গ্রহণের পর বলেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে কোন ব্যক্তি আমার নিকটে ঘৃণার পাত্র ছিলেন না। কিন্তু যখন আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম তখন আমার দৃষ্টিতে তার চেয়ে অধিক ভালোবাসার ও সম্মানের পাত্র কেউ ছিল না। তিনি বলেন: যদি আমাকে তার গুণাগুণ বর্ণনা করতে বলা হয় তবে আমি তা

পারব না। কারণ, তার সম্মাণার্থে আমি কোন সময় তার দিকে দু'চোখ ভরে (ভালো করে) তাকাইনি।

উরওয়াহ্ ইবনে মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) কোরাইশদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন: হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর শপথ, আমি "কিসরা", "কায়সার" ও অন্যান্য বাদশাহদের নিকটে রাষ্ট্রদূত হিসাবে গিয়েছি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবাগণ তাকে যতটুকু সম্মান করেন, অন্য কোন বাদশাহর সহচরবৃন্দকে ততটুকু সম্মান করতে দেখিনি। আল্লাহর শপথ! তার সম্মানার্থে স্বীয় সাথীরা তার চোখে চোখ রাখতে পারতেন না। যখনি তিনি কফ ও শ্লেষ্মা নিক্ষেপ করতেন তখন তা সাহাবীদের কারো না কারো হাতে পড়ত এবং তিনি তা দিয়ে স্বীয় চেহারা ও বক্ষ মর্দন করতেন। যখন তিনি উযূ করতেন তখন তারা তার উযূর পানি নেয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন।[৮১]

২। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মর্যাদা ও সম্মানের ক্ষেত্রে বাড়া-বাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করা নিষেধ।

الغلو (আল্ গুলু): এটা আরবী শব্দ, যার অর্থ: সীমালঙ্ঘন করা। যখন কোন ব্যক্তি কারো সম্মানের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে তখন আরবী পরিভাষায় বলা হয়: غَلا غُلُوًّا অর্থাৎ সে সম্মানের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, {لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} তোমরা তোমাদের দীনের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করিও না। *সূরা আন্ নিসা ১৭১।*

الإطراء (আল্ ইত্বরা'): এটাও আরবী শব্দ যার অর্থ প্রশংসার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা এবং তাতে মিথ্যা বলা।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষেত্রে সীমালংঘনের ব্যাখ্যা হলো:

তার সম্মানের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করা। যেমন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দাসত্ব ও রিসালাতের স্তর থেকে উপরে উঠিয়ে উপাস্যের কোন বৈশিষ্ট্য তার জন্য নির্ধারণ করত আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার নিকটে প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করা এবং তার নামে শপথ করা।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষেত্রে "ইত্বরা" এর ব্যাখ্যা হলো: তার প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা তা থেকে নিষেধ করেছেন:

---

[৮১] জালাউল আফ্হাম ১২০-১২১ পৃষ্ঠা।

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.

প্রশংসার ক্ষেত্রে তোমরা আমাকে নিয়ে সীমালঙ্ঘন করিও না। যেমন, খ্রিষ্টানেরা ঈসা ইবনে মারঈয়াম (আলাইহিস সালাম) এর প্রশংসার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে ছিল। আমি তো কেবল আল্লাহর একজন বান্দা। অতএব, তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তার রসূল বলো।[৮২]

অর্থাৎ বাতিল ও মিথ্যা দিয়ে তোমরা আমার প্রশংসা করবে না এবং এক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনও করবে না। যেমন, খ্রিষ্টানেরা ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করে তাকে মাবূদ বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ আমাকে যেগুণে গুণান্বিত করেছেন তোমরা আমাকে সেই গুণে গুণান্বিত করত আল্লাহর বান্দা ও তার রসূল বলে সম্বোধন করবে। যখন তার কিছু সাহাবী তাকে أنت سيّدُنا [আন্‌তা সাইয়িদুনা]-আপনি আমাদের নেতা বা মালিক। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: السَّيّدُ الله تبارك وتعالى -সাইয়িদ-মালিক বা প্রভু হলেন মহান রব্বুল আলামীন। সাহাবাগণ যখন বললেন: আপনি আমাদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান এবং দানশীল। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ.

তোমরা তোমাদের এ কথা অথবা কিছু কথা বলতে পারো। তবে শয়তান যেন তোমাদের ওপর সওয়ার না হয়।[৮৩]

কতিপয় লোক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন: হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হে আমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি ও সর্বোত্তমের সন্তান। আমাদের নেতা এবং নেতার সন্তান। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

يا أيها الناس، قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبدُ الله ورسولُه، ما أحبُّ أن ترفعوني فوقَ منزلتي التي أنزلني الله عزّ وجلّ.

হে মানুষেরা, তোমরা তোমাদের কথা বলতে থাকো। তবে শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করতে না পারে। আমি মুহাম্মাদ, আল্লাহর

---

[৮২] সহীহ বুখারী হা/৩৪৪৫।

[৮৩] সহীহ: আবূ দাউদ হা/৪৮০৬

বান্দা ও রসূল। আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তোমরা আমাকে তার ঊর্ধ্বে স্থান দাও এটা আমি পছন্দ করি না।[৮৪]

সৃষ্টির মাঝে সার্বিক দিক দিয়ে উত্তম ও মর্যাদাবান হওয়া সত্ত্বেও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত শব্দাবলি দ্বারা নিজের প্রশংসা করাকে অপছন্দ করেছেন: أنت سيدنا [আন্তা সাইয়িদুনা]-আপনি আমাদের নেতা, أنت خيرُنا [আন্তা খাইরুনা]-আপনি আমাদের মাঝে সবচেয়ে ভালো, أنت أفضلُنا [আন্তা আফযালুনা]-আপনি আমাদের মধ্যে উত্তম এবং أنت أعظمُنا আপনি আমাদের মধ্যে মর্যাদাবান।

নিজের অধিকারের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও সীমালঙ্ঘন করা থেকে দূরে থাকতে এবং তাওহীদের সংরক্ষনের জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত শব্দাবলি দ্বারা তার প্রশংসা করতে নিষেধ করেছেন। বান্দার জন্য সর্বোচ্চ মর্যাদা জ্ঞাপক দু'টি গুণ দ্বারা তিনি তাকে গুণান্বিত করতে বলেছেন। ঐ দুটি শব্দে আকীদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন নেই এবং তাতে কোন ক্ষতিরও আশংকা নেই। সে শব্দ দুটি হলো, আব্দুল্লাহ্ - আল্লাহর বান্দা এবং ওয়া-রসূলুহু - তার রসূল। আল্লাহ তাকে যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে সন্তুষ্ট হয়েছেন এর চেয়ে বেশি মর্যাদা দেয়াকে তিনি অপছন্দ করেছেন। অথচ অনেক মানুষ তার নিষেধের কোন তোয়াক্কা না করে তাকে ডাকা, তার নিকটে উদ্ধার কামনা করা, তার নামে শপথ করা এবং এমন বস্তু তার নিকটে প্রার্থনা করে যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকটে চাওয়া কখনো জায়িয নয়।

যেমন, বিভিন্ন মীলাদ মাহফিল, রসূলের নামে গাওয়া কাসিদাহ (কবিতা ছন্দ) এবং ইসলামী সংগীতে বলা হয়। অথচ এসকল লোকেরা আল্লাহ এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অধিকারের মাঝে কোন পার্থক্য করে না।

আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) তার নূনিয়্যাহ্ নামক আকীদার কবিতায় বলেন:

আল্লাহ তা'আলার এমন অধিকার বা হক রয়েছে যা অন্যের জন্য প্রযোজ্য নয়। বান্দারও অধিকার বা হক রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার পৃথক

[৮৪] সহীহ: মুসনাদে আহ্‌মাদ হা/১৩৫২৯

হক রয়েছে। অতএব, দু'হকের মাঝে তারতম্য ও পার্থক্য না করে তোমরা দু'হককে এক হকে পরিণত করিও না।[৮৫]

৩। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মর্যাদা:

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে প্রশংসা ও মর্যাদা উল্লেখ করেছেন তা বর্ণনা করা ও সে অনুযায়ী বিশ্বাস রাখাতে কোন অসুবিধা নেই। তার রয়েছে আল্লাহর প্রদত্ত সু-উচ্চ মর্যাদা। তিনি হলেন, আল্লাহর বান্দা ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সৃষ্টির সেরা এবং সার্বিকভাবে সকল সৃষ্টি জীবের চেয়ে উত্তম। সকল জিন ও ইনসানের নিকটে তিনি রসূল হিসাবে প্রেরিত। তিনি শ্রেষ্ঠ রসূল এবং শেষ নাবী। তার পরে আর কোন নবী আসবেন না। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য তার নাবীর বক্ষকে খুলে দিয়েছিলেন এবং তার খ্যাতিকে তিনি সমুন্নত করেছেন। যারা তার বিরোধী আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত ও নিচু করেছেন। তিনি হলেন, প্রশংসিত স্থানের অধিকারী। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا ﴾

শিগগিরই আপনার পালনকর্তা আপনাকে মাকামে মাহমুদে (সম্মানিত স্থানে) পৌঁছাবেন। *সূরা বানী ইসরাঈল ৭৯।*

অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের কঠিন পরিস্থিতি থেকে স্বীয় বান্দাদেরকে উদ্ধারের নিমিত্তে তাদের সুপারিশের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে স্থানে তার নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অধিষ্ঠিত করবেন তাই হলো মাকামে মাহমুদ। সকল নাবীগণের মাঝে এ স্থানটি কেবল মাত্র নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য নির্দিষ্ট। সকল সৃষ্টির মাঝে তিনি আল্লাহকে সর্বাধিক ভয়কারী এবং তাকওয়া অর্জনকারী ছিলেন। তার উপস্থিতিতে উম্মাতকে আল্লাহ তা'আলা উঁচু স্বরে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। আর যারা তার সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বরকে নিচু রাখে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করে বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجۡهَرُواْ لَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ أَن تَحۡبَطَ أَعۡمَٰلُكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ ۝٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصۡوَٰتَهُمۡ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمۡتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمۡ لِلتَّقۡوَىٰۚ لَهُم

---

[৮৫] আল্ জাওয়াবুল ফায়িক ফির রদ্দে আলা মুবাদ্দিলিল হাকায়িক পৃ. ৫৯।

مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝٤ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا۟ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বল, তার সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না। যারা আল্লাহর রসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্যে শোধিত করেছেন। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উচুস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ। যদি তারা আপনার বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত সবর করত, তবে তা-ই তাদের জন্যে মঙ্গলজনক হত। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *সূরা আল হুজুরাত ৪৯:২-৫।*

ইমাম ইবনে কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: অত্র আয়াতগুলোর মাধ্যমে মহান রব্বুল আলামীন স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কিভাবে সম্মান, মর্যাদা, শ্রদ্ধার সাথে ব্যবহার করবে তা শিক্ষা দিয়েছেন। সকল মানুষকে যেমন তাদের নাম ধরে ডাকা হয় সেভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নাম ধরে ডাকতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। যেমন, ইয়া মুহাম্মাদ বা হে মুহাম্মাদ বলা। বরং নবূয়ত ও রিসালাতের বিশেষণ দ্বারা তাকে আহ্বান করতে হবে। যেমন, ইয়া রসূলুল্লাহ (হে আল্লাহর রসূল) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ্ (হে আল্লাহর নাবী) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ﴾

রসূলের আহবানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহ্বানের মত গণ্য করো না। *সূরা আন্ নূর ২৪:৬৩।*

আল্লাহ তা'আলা নিজেও তাকে يا أيها النبي (হে নবী) ও يا أيها الرسول (হে রসূল) বলে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তার প্রশংসা করত তার ওপর রহমত নাযিল করেন, ফেরেশতাগণ তার জন্য আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চেয়ে দুআ করেন। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকেও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর দরুদ ও সালাম পেশ করতে আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা নাবীর ওপর রহমত নাযিল করেন এবং তার ফেরেশতাগণ নাবীর জন্য আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চেয়ে দুআ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নাবীর জন্যে রহমতের দুআ কর এবং তার প্রতি সালাম প্রেরণ কর। *সূরা আল্ আহযাব ৩৩:৫৬।*

তবে কুরআন হাদীসের বিশুদ্ধ দলীল ব্যতীত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রশংসার জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় বা তার প্রশংসার কোন ধরন নির্ধারণ করা যাবে না। মিলাদুন্নাবি বা জন্মবার্ষিকী পালনকারীর দল ধারণা প্রসূত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রশংসার জন্য যে দিন ও পদ্ধতি ধার্য করে নিয়েছে তা স্পষ্ট ও ঘৃণিত বিদআত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সম্মান করার অর্থ হলোঃ তার সুন্নাতকে সম্মান করা। সে অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক এ বিশ্বাস রাখা। সম্মান ও আমল করার দিক দিয়ে তার সুন্নাত (হাদীস) কুরআনের পরেই দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে। কারণ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসও আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী/প্রত্যাদেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ۝٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٌ يُوحَىٰ﴾

তিনি (রসূল) প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। তিনি যে কথা বলেন তা ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়। *সূরা আন নাজ্‌ম ৫৩:৩-৪।*

অতএব, হাদীসের ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ ও তার মর্যাদায় কোন কমতি করা জায়িয নয়। সন্দেহাতীতভাবে অবগত না হওয়া পর্যন্ত তার কোন হাদীসকে সহীহ-যঈফ বলা কিংবা তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা আদৌ বৈধ নয়। বর্তমান সময়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের বিরুদ্ধে অজ্ঞদের বাড়া-বাড়ি চরমে পৌঁছেছে। বিশেষত কিছু উদীয়মান যুবক যারা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে অবস্থান করছে তারাও শুধু কিছু কিতাবাদি পড়ে জ্ঞানহীন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন হাদীসকে সহীহ-যঈফ বলা এবং অনেক বর্ণনাকারীকে দোষারোপ করা শুরু করেছে। আর তা তাদের ও উম্মাতের জন্য বিরাট ক্ষতিকর বিষয়। অতএব, এসকল যুবকদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং নিজেদের জ্ঞানানুযায়ী কথা বলা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য ও অনুকরণ করা ওয়াজিব

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশ বাস্তবায়ন এবং নিষেধকৃত কাজ পরিত্যাগের মাধ্যমে তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহর রসূল বলে সাক্ষ্য দেয়ার চাহিদা। অনেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রসূলের আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন। কখনো তার আনুগত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট করে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ﴾

হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। *সূরা আন্ নিসা ৪:৫৯।*

কখনও এককভাবে রসূলের আনুগত্যের কথা বলেছেন, যেমন তিনি বলেন:

﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَ﴾

যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। *সূরা আন্ নিসা ৪:৮০।* অপর আয়াতে তিনি বলেন:

﴿وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ﴾

তোমরা রসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা দয়া প্রাপ্ত হও। *সূরা আন্ নূর ২৪:৫৬।*

আবার কখনো আল্লাহ তা'আলা তার রসূলের বিরোধীদের ক্ষেত্রে শাস্তির ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন:

﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

যারা রসূলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন এমর্মে সতর্ক হয়ে যায় যে, যে কোন মূহুর্তে ফিৎনায় পতিত হবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। *সূরা আন্ নূর ২৪:৬৩।*

অর্থাৎ তাদের হৃদয়ে কুফরী বা মুনাফিকী বা বিদআতের ফিৎনা পৌঁছতে পারে। অথবা দুনিয়াতে হত্যা, সাজা, বন্দি বা তাৎক্ষণিক কঠিন শাস্তির দ্বারা দুনিয়ায় সাজা পেতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করাকে বান্দার জন্য আল্লাহর ভালোবাসা লাভ ও গুনাহমোচনের কারণ সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾

বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তবে আমার (রসূলের) আনুগত্য কর, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মোচন করবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। *সূরা আলে ইমরান ৩:৩১।*

রসূলের আনুগত্যকে আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত ও তার অবাধ্য হওয়াকে পথভ্রষ্টতা বলে উল্লেখ করে বলেন:

﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهۡتَدُواْۚ﴾

এবং যদি তোমরা তার (রসূলের) অনুসরণ করো তবে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। *সূরা আন্ নূর ২৪:৫৪।* অপর আয়াতে তিনি বলেন:

﴿فَإِن لَّمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهۡوَآءَهُمۡۚ وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيۡرِ هُدٗى مِّنَ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾

অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হিদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। *সূরা আল কাসাস ২৮:৫০।*

আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদও দিয়েছেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাঝে তার উম্মাতের জন্য উন্নত আদর্শ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا﴾

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। *সূরা আল্ আহ্যাব ৩৩:২১।*

ইমাম ইবনে কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: এ আয়াতটি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা, কাজ ও যাবতীয় অবস্থায় তার অনুসরণ ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে একটি বড় মূলনীতি। এজন্য রব্বুল আলামীন আহযাবের (খন্দকের) যুদ্ধে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ধৈর্য্য ধারণ, অন্যদেরকে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দান, পরস্পর যোগাযোগ রক্ষা, তার কষ্ট সহ্য করা এবং স্বীয় রব্বের পক্ষ থেকে বিপদ দূরীকরণে অপেক্ষা করার ক্ষেত্রে তার অনুসরণ এবং অনুকরণ করতে মানুষদেরকে আদেশ দিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত অনবরত তার ওপর আল্লাহর রহমাত ও শান্তি নাযিল হোক।

মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনের প্রায় চল্লিশ স্থানে রব্বুল আলামীন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য ও অনুসরণের কথা উল্লেখ করেছেন। অতএব, মানুষেরা তাদের পানাহারের চেয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা জানা ও অনুসরণের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী। কারণ, পানাহার না করলে মানুষ খুব জোর দুনিয়াতে মারা যাবে। অপর দিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ ও আনুগত্য না করলে চিরস্থায়ী দুর্ভাগ্য ও শাস্তি বরণ করতে হবে।

ইবাদতের ক্ষেত্রে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অনুসরণ করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি যাবতীয় ইবাদত যেভাবে আদায় করেছেন এবং করতে বলেছেন আমাদেরকে সেভাবেই তা আদায় করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহর মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। *সূরা আল্ আহ্যাব ৩৩:২১।* নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বলেছেন:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখো সেভাবে সালাত আদায় করো।[৮৬] তিনি আরো বলেন:

---

[৮৬] সহীহ বুখারী হা/৬৩১, ৬০০৮।

خُذُوا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ.

তোমরা আমার নিকট হতে তোমাদের হজ্জের নিয়ম কানুন গ্রহণ করো।[৮৭] তিনি আরো বলেন,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যার ওপর আমাদের দীন নেই তা প্রত্যাখ্যাত।[৮৮] তিনি আরো বলেন,

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হল সে আমার দলভুক্ত নয়।[৮৯]

এছাড়াও আরো অনেক দলীল রয়েছে যাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশের আনুগত্য করতে এবং তার বিরোধীতা করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ﴾

তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে ধারণ কর এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ো না। *সূরা ইমরান ৩:১০৩*

---

[৮৭] সহীহ মুসলিম হা/১২৯৭।

[৮৮] সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম হা/১৭১৮।

[৮৯] সহীহ বুখারী হা/৫০৬৩, সহীহ মুসলিম হা/১৪০১।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর সালাত-দরূদ ও সালাম পাঠের বিধান

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য তার উম্মাতের ওপর মহান রব্বুল আলামীন যে হক শরীআত সম্মত করেছেন তা হলো, তার উপরে সালাত ও সালাম পেশ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ﴾

আল্লাহ নাবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তার ফেরেশতাগণও নাবীর জন্য আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চেয়ে দুআ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নাবীর জন্যে অনুগ্রহের দুআ কর এবং তার প্রতি সালাম প্রেরণ কর। *সূরা আল্ আহযাব ৩৩:৫৬।*

আয়াতে বর্ণিত রসূলের ওপর আল্লাহর সালাত প্রেরণের অর্থ হলো: ফেরেশতাদের নিকটে আল্লাহ কর্তৃক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রশংসা করা। ফেরেশতাদের সালাত প্রেরণের অর্থ: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য দুআ করা। মানুষের পক্ষ থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর সালাত পেশের অর্থ হলো: তার জন্য আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চাওয়া।[৯০]

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের মাঝে স্বীয় নাবী ও বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মর্যাদার সংবাদ দিয়ে বলেন যে, নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের নিকটে তিনি রসূলের প্রশংসা করেন এবং ফেরেশতাগণ নাবীর জন্য আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিম্নজগত তথা দুনিয়াবাসীকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সালাত ও সালাম পেশের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে ঊর্ধ্ব ও নিম্ন উভয় জগতবাসীর প্রশংসা তার ওপর একত্রে বর্তিত হয়।

আয়াতে বর্ণিত ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ এর অর্থ: ইসলামের অভিবাদন দিয়ে তাকে সম্মান ও শুভেচ্ছা জানাও। কেউ যখন রসূলের ওপর সালাত পেশ করে তখন যেন সালাত ও সালাম উভয়টি পেশ করে। আর উভয়টির কোন একটিকে যেন যথেষ্ট মনে না করে। যেমন, শুধু 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি' অথবা শুধু

---

[৯০] সহীহ বুখারী তাফসীর অধ্যায় ৪৭৯৭ নং হাদীসের পূর্ববর্তী অংশ।

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ না বলে। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সালাত-সালাম উভয়টি পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

বিভিন্ন স্থানে ওয়াজিব অথবা গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব হিসাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সালাত (দরূদ) পেশ করতে বলা হয়েছে। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) স্বীয় “জালাউল আফহাম” কিতাবে একচল্লিশটি স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। শুরুতেই তিনি বলেছেন: প্রথম স্থান হলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান, আর তা হলো, সালাতের শেষ বৈঠকে। সকল উলামাগণ তা শরীআত সম্মত হওয়ার বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। তবে ছ্বলাতে তা ওয়াজিব কি না সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

এরপর রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওপর সালাত পেশের আরো স্থানগুলো হচ্ছে: দুয়া কুনুতের শেষে, জুমআর খুৎবা-দুই ঈদের খুৎবা এবং সলাতুল ইস্তিস্কা বা বৃষ্টি প্রার্থনার খুৎবায়, মুয়াজ্জিনের আযানের জওয়াব দেয়ার পর, যে কোন দুয়া করার সময়, মসজিদে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সময়, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম উল্লেখের সময় ইত্যাদি। এরপর তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর সালাত পেশের চল্লিশটি ফযীলত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১। আল্লাহর আদেশ মানা হয়।

২। একবার রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওপর দরূদ/ সালাত পাঠের বিনিময়ে বান্দা দশবার আল্লাহর রহমত লাভ করে থাকে।

৩। দুয়ার শুরুতে রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওপর দরূদ/ সালাত পেশ করলে ঐ দুয়া কবুলের আশা করা যায়।

৪। যে ব্যক্তি রসূলের ওপর সালাত পেশ করে তার জন্য ওসীলা তলব করবে এটা ঐ ব্যক্তির জন্য রসূলের শাফা‘আত লাভের কারণ হবে।

৫। রসূলের প্রতি দরূদ/ সালাত পেশ গুনাহ মোচনের কারণ।

৬। রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওপর সালাত ও সালাম পেশকারী ব্যক্তি তার জওয়াব (উত্তর) পেয়ে থাকেন। অতএব, সম্মানিত নাবীর ওপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। আমীন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারের মর্যাদা, তাদের জন্য করণীয় ও বর্জনীয়-আহ্‌ল আল-বাইতের ব্যাপারে সঠিক নীতিমালা

আহলে বাইত হলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারবর্গ যাদের প্রতি সাদাকা/দান গ্রহণ হারাম। তারা হলেন: আলী, জাফার, আকীল এবং আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর পরিবারবর্গ, হারিস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানাদি এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিণী ও কন্যাগণ। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

হে রসূলের পরিবারবর্গ আল্লাহ কেবল তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং পুতঃপবিত্র রাখতে চান। *আল্‌ আহযাব ৩৩:৩৩।*

ইমাম ইবনে কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: যে ব্যক্তি কুরআন নিয়ে গবেষণা করবে সে নিশ্চিত জানতে পারবে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীগণ আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

হে রসূলের পরিবারবর্গ আল্লাহ কেবল তোমাদের থেকে অপবিত্র দূর করতে এবং পুতঃপবিত্র রাখতে চান। *আল আহযাব ৩৩:৩৩।*

কেননা বর্ণনা ভঙ্গি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পত্নীগণের পক্ষেই কথা বলে। অর্থাৎ তারা রসূলের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য এ সংক্রান্ত সকল আলোচনার পর বলা হয়েছে:

﴿وَٱذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِى بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾

আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষদর্শী, সর্ববিষয়ে খবর রাখেন। *সূরা আল্‌ আহযাব ৩৩:৩৪।*

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে স্বীয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর কুরআন হাদীসের যা কিছু তোমাদের গৃহে নাযিল হয় সে অনুযায়ী তোমরা আমল করো। কাতাদাসহ একাধিক মুফাসসির পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা করেছেন।

সকল মানুষদের মাঝে তোমরা যে নিয়ামতের দ্বারা বিশেষিত হয়েছো তা স্মরণ করো। আর সে নিয়ামত হলো: সকল মানুষ ব্যতীত কেবল মাত্র তোমাদের গৃহে ওহী নাযিল হয়। আবূ বকর সিদ্দীক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কন্যা আয়িশা সিদ্দীকা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এ ব্যাপক নিয়ামতের জন্য অধিক উপযোগী ছিলেন। কারণ রসূলের ভাষ্য অনুযায়ী তার পত্নীগণের মধ্যে কেবল আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর বিছানাতেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর ওহী নাযিল হয়েছিল। কতেক উলামা বলেছেন: কারণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ব্যতীত অন্য কোন কুমারী নারীকে বিবাহ করেননি এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ তার বিছানায় ঘুমাননি। (অর্থাৎ আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করেননি, রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য সকল স্ত্রীর আগে অন্য স্থানে বিবাহ হয়েছিল)।

সঙ্গত কারণেই আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) উপরোক্ত বিশেষণ এবং উঁচু মর্যাদায় বিশেষিত হওয়ার উপযুক্ত হয়েছে। তবে রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পত্নীগণ যখন তার পরিবারের আওতাভুক্ত হয়েছেন তখন তার নিকটাত্মীয়গণ আহলে বাইতের অধিক হকদার।[৯১] তাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারকে ভালোবাসেন, তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাদের ক্ষেত্রে বর্ণিত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওসিয়তের হিফাযত করেন। কারণ গাদিরে খুমের (একটি স্থানের নাম) দিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন:

أُذَكِّرُكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي.

আমার পরিবারবর্গের ক্ষেত্রে আমি তোমাদিগকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।[৯২]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারকে ভালোবাসেন এবং সম্মান করেন। কারণ এতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভালোবাসা এবং সম্মান করা হয়। তবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারকে ভালোবাসার জন্য শর্ত হল: তাদের পূর্ববর্তীগণ যেমন সুন্নাতের অনুসারী এবং দীন ইসলামের ওপর অটল ছিলেন সেরকম আহলে বাইতের যারা এটা মেনে চলবে তাদেরকে ভালোবাসতে এবং সম্মান করতে হবে। তাদের পূর্ববর্তীগণের দৃষ্টান্ত হল:

---

[৯১] তাফসীর ইবনে কাসীর থেকে গৃহিত।

[৯২] সহীহ মুসলিম হা/২৪০৮।

আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং তার সন্তানাদি, আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং তার সন্তানাদি। অপর দিকে আহলে বাইতের কেউ যদি সুন্নাতের বিরোধীতা করত দীন ইসলামের ওপর অটল না থাকে তবে আহলে বাইত হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে বন্ধুত্ব রাখা জায়িয নয়।

অতএব, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অবস্থান হলো মধ্যমপন্থা ও ইনসাফ ভিত্তিক। তারা আহলে বাইতের মধ্যে দীনদার ও ইসলামের ওপর অবিচল ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব রাখেন। অপর দিকে আহলে বাইতের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও দীন বিমুখ ও সুন্নাতের বিরোধী হলে তার সাথে আহলুস সুন্নাহ নিজেদের বন্ধুত্ব ছিন্ন করেন। দীনের ওপর অবিচল না থাকলে আহলে বাইতের সদস্য এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটত্মীয় হয়েও কোন উপকার হবে না। আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ } قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا.

যখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} আপনি স্বীয় নিকটত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন করুন। *সূরা আশ্ শুআরা ২১৪।* তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন: হে কুরাইশ সম্প্রদায় (অথবা অনুরূপ শব্দ তিনি বলেছিলেন) আপনারা আপনাদের জীবনকে ক্রয় করে নিন। (অর্থাৎ শিরকের পথ পরিত্যাগ করে তাওহীদের পথ ধরে সে অনুযায়ী আমল করে জান্নাতের হকদার হয়ে জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচাও)। আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ব্যাপারে আমি আপনাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে আব্বাস ইবনে আব্দুল্ মুত্তালিব আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির ক্ষেত্রে আমি আপনার কোন উপকার করতে পারব না। হে রসূলের ফুফু সফিইয়্যাহ্, আমি আল্লাহর দরবারে আপনার কোন উপকার করতে পারব না। হে ফাতিমাহ্ বিনতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুমি আমার সম্পদ হতে যা ইচ্ছা

চেয়ে নাও। কারণ, আমি আল্লাহর দরবারে তোমার কোন উপকার করতে পারব না।[৯৩] অপর হাদীসে বলা হয়েছেঃ

مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

যার আমল তাকে পিছনে ফেলে দেয় তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিতে পারবে না।[৯৪]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারের ব্যাপারে রাফেযী-শিয়াদের নীতি থেকে মুক্ত। অতিরঞ্জন করে রাফেযীরা আহলে বাইতের কতেক সদস্যকে নিষ্পাপ বলে দাবি করে। আহলে বাইতের যারা সঠিক দীনের ওপর অবিচল ছিলেন তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী ও তাদেরকে দোষারোপকারী নাওয়াসিবদের নীতি থেকেও আহলুস ওয়াল জামাআত নিজেদেরকে মুক্ত রাখেন। আহলে বাইতের মাধ্যমে ওসীলাহকারী এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে মা'বূদ হিসাবে গ্রহণকারী বিদআতী ও অপসংস্কৃতিতে বিশ্বাসীদের নীতি থেকেও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত মুক্ত।

অতএব, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত এ বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী এবং সঠিক পথের পথিক। এ বিষয়ে তারা বাড়াবাড়ি ও ঘাটতি করেন না। তারা আহলে বাইত ও অন্যান্যদের অধিকারের ক্ষেত্রে কমতি ও সীমালঙ্ঘন করেন না। আহলে বাইতের মধ্যে সঠিক পথের ওপর অবিচল ব্যক্তিবর্গও নিজেদের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করাকে অপছন্দ করেন এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের থেকে নিজেদেরকে মুক্ত বলে বিশ্বাস করেন। যারা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল, তিনি তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) ও তাদের হত্যা করাকে সম্মতি দিয়েছিলেন। তবে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাদেরকে আগুন দিয়ে না জ্বালিয়ে তরবারী দিয়ে হত্যা করতে হতো। সীমালঙ্ঘনকারীদের সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা'কেও আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে পালিয়ে আত্মগোপন করে।

---

[৯৩] সহীহ বুখারী হা/২৭৫৩, ৪৭৭১।

[৯৪] সহীহ মুসলিম হা/২৬৯৯।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ:

সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা, তাদের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় বিশ্বাস এবং তাদের মাঝে সংঘটিত বিবাদ সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অবস্থান

১। সাহাবী দ্বারা উদ্দেশ্য কি এবং তাদের বিষয়ে কিরূপ বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব: সাহাবাতুন (صحابة) শব্দটি আরবী সাহাবী শব্দের বহু বচন। আর সাহাবী হলেন: ঐ ব্যক্তি যিনি রসূলের প্রতি ঈমানের সহিত তার সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং ঈমানের ওপরই মৃত্যু বরণ করেছেন। তাদের ক্ষেত্রে যে বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব তা হলো: তারা হলেন, উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের যুগও সর্বোত্তম যুগ।

কারণ, তারা এ উম্মাতের সর্বাগ্রের লোক, তারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথী হওয়া, তার সাথে একত্রে জিহাদ করা, তার নিকট হতে শরীআত গ্রহণ করত তাদের পরবর্তীগণের নিকটে তা পৌঁছে দেয়াসহ আরো বিভিন্নগুণে বিশেষিত ও বিশিষ্ট ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বিজ্ঞানময় কুরআনে তাদের প্রশংসা করে বলেন,

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ﴾

আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ। যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা। *সূরা আত-তাওবা ৯:১০০।*

অপর স্থানে রব্বুল আলামীন বলেন,

﴿مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ

عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًۢا﴾

মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল এবং তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সিজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন। তাওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের ওপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে-চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে-যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। *সূরা আল ফাত্হ ৪৮:২৯।* আল্লাহ তা'আলা অপর আয়াতে বলেন,

﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ ﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾

এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিলাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ ও তার রসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী। যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। *সূরা আল্ হাশ্র ৫৯:৮-৯।*

পূর্বোক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসা করেছেন। তাদেরকে কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদ দিয়েছেন যে, সাহাবাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, তাদের জন্য জান্নাত (উদ্যানসমূহ) প্রস্তুত করে রেখেছেন: আর

তারা পরস্পর দয়াপরবশ, কাফেরদের প্রতি বড় কঠোর, তারা অধিক রুকু-সিজদাহ্কারী (অধিক সালাত আদায়কারী), তাদের হৃদয় অত্যন্ত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার, ঈমান ও আনুগত্যের চিহ্ন দ্বারা সবার মাঝে পরিচিত, আল্লাহ তা'আলা তাদের মাধ্যমে স্বীয় কাফের শত্রুদের অন্তর জ্বালা সৃষ্টির জন্য তাদেরকে স্বীয় নাবীর সাথী হিসাবে বাছাই করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা একথাও বলেছেন যে, মুহাজির সাহাবীগণ আল্লাহ তা"আলার জন্য, তার দীনের সাহায্যার্থে, তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় নিজেদের মাতৃভূমি ও ধন-সম্পদ ত্যাগ করেছেন এবং এ ব্যাপারে তারা সত্যবাদী। আনসার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন: তারা হলেন, দারুল হিজরাহ্ মদীনার অধিবাসী, মুহাজির সাহাবীগণসহ দীনের সার্বিক সহযোগী এবং স্বচ্ছ ঈমানের অধিকারী। আনসারগণ তাদের মুহাজির ভাইদেরকে ভালোবাসেন, তাদেরকে নিজেদের জীবনের ওপর প্রাধান্য দেন, তারা মুহাজিরগণের সহযোগী, তাদের হৃদয় কৃপণতা থেকে মুক্ত, সঙ্গত কারণেই তারা সফলতা অর্জন করেছেন। এ হলো সাহাবায়ে কিরামের কিছু ফযীলত ও মর্যাদার নমুনা। তাছাড়া ইসলাম গ্রহণ, জিহাদ ও হিজরতে অগ্রগামীতার ভিত্তিতে প্রত্যেক সাহাবীর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে যা দ্বারা তারা একে অপরের ওপর মর্যাদাবান ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা সকল সাহাবীগণের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আমীন।

সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী হলেন চার খলীফাহ: আবু বাক্র, উমার, উসমান এবং আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)। অতঃপর দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অবশিষ্টগণ, তারা হলেন: উপরের চারজন (আবু বাকর, উমার, উসমান এবং আলী), তালহা, যুবাইর, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, আবূ উবাইদাহ ইবনে জার্রাহ, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, সাঈদ ইবনে যাইদ।

মুহাজির সাহাবীগণ আনসার সাহাবায়ে কিরামের ওপর মর্যাদাবান। এর পরের মর্যাদায় রয়েছেন বদরী সাহাবায়ে কিরাম এবং বায়আতে রিদ্বওয়ানের (হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যারা তথায় একটি গাছের নিচে রসূলের হাতে হাত রেখে বায়আত করেছিলেন) সদস্য বৃন্দ। এরপর যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের জন্য জিহাদ করেছেন তারা পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারী ও জিহাদকারীদের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান।

২। সাহাবীগণের মাঝে সংঘটিত লড়াই ও গোলযোগের বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নীতি:

গোলযোগের কারণ: ইয়াহূদীরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ইয়ামানের আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা নামক এক ইয়াহূদী শয়তান ও প্রতারণাকারী

ধোঁকাবাজকে ইসলামের মাঝে প্রবেশ করিয়ে দেয়। সে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইসলামে প্রকাশ করলেও ভিতরে সম্পূর্ণ তার উল্টো ছিল। এ দুষ্ট ইয়াহূদী তার কুটিল ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে খোলাফায়ে রাশিদার তৃতীয় খলীফা উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বিরুদ্ধে তার হিংসা, ক্রোধ ও বিষবাষ্প ছড়াতে থাকে। এ শয়তান তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপবাদ রটাতে থাকে। ফলে স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন, দুর্বল ঈমান এবং কলহ ও বিবাদ প্রিয় কিছু লোক তার মাধ্যমে ধোকাগ্রস্থ হয়ে তার দলে শরীক হয়। পরিশেষে এ চক্রান্তের শিকার হয়ে সঠিক পথে সদা অবিচল ন্যায়পরায়ণ খলীফাহ উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অত্যাচারিত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। তার শাহাদাতের পরেই মুসলমানদের মাঝে মতানৈক্য শুরু হয়। এ ইয়াহূদী এবং তার দোসরদের প্ররোচণায় ফিৎনার আগুন জ্বলে উঠে এবং ইজতিহাদের ভিত্তিতে সাহাবাগণের মাঝে মতানৈক্য ও সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে।

আকীদা তাহাবিয়্যার ব্যাখ্যাকার বলেন: রাফেযী-শিয়া মতবাদের মূলনীতি প্রণয়ন করে একজন মুনাফিক এবং যিন্দীক (প্রকাশ্যে ইসলামের দাবিদার কিন্তু অন্তরে কুফরী বিদ্যমান) ব্যক্তি। তার ইচ্ছা ছিল দীন ইসলামের মূলোৎপাটন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নিন্দা ও কুৎসা রটনা করা। উলামাগণ এরূপই উল্লেখ করেছেন। কারণ আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা যখন বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে তখন তার উদ্দেশ্য ছিল স্বীয় জঘণ্য ও ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামকে নষ্ট করা। যেমন "বুলিস" নামক এক ইয়াহূদী খ্রিষ্টান ধর্মকে নষ্ট করে।

আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা দরবেশী ও তাপসী জাহির করে ভালো কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করা শুরু করে। আর এ দরবেশীর আড়ালে চক্রান্ত করে সে ফিৎনার সৃষ্টি করে উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে হত্যা করে। তারপর সে কুফাতে আগমন করে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি এবং তাকে সাহায্য করার কথা প্রকাশ করতে লাগল। যাতে সে এ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে স্বীয় উদ্দেশ্য সফল করতে সক্ষম হয়। আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকটে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবাকে হত্যা করতে বলেন। তখন সে কারকীসে পলায়ন করে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবার কুকীর্তির কালো অধ্যায় ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

فلما قتل رضي الله عنه تفرقت القلوب وعظمت الكروب وظهرت الأشرار وذل الأخيار وسعى في الفتنة من كان عاجزا عنها وعجز عن الخير والصلاح من كان يحب إقامته

فبايعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أحق الناس بالخلافة حينئذ وأفضل من بقي لكن كانت القلوب متفرقة ونار الفتنة متوقدة فلم تتفق الكلمة ولم تنتظم الجماعة ولم يتمكن الخليفة وخيار الأمة من كل ما يريدونه من الخير ودخل في الفرقة والفتنة أقوام وكان ما كان.

উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে হত্যার পর মানুষের হৃদয়সমূহ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং বিপদাপদ বড় কঠিন হয়ে দেখা দিল। বিভিন্ন প্রকার খারাপি প্রকাশিত হয়ে ভালো লোকেরা লাঞ্ছিত হতে লাগলেন। যারা ফিৎনা ছড়াতে পারছিল না তারা বিভিন্ন ফিৎনা-ফাসাদ ছড়াতে জোর প্রচেষ্টা ব্যয় করতে লাগল। যারা কল্যাণ এবং সততা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তারা অপারগ হয়ে গেলেন। তদুপরি তারা বুক ভরা আশা নিয়ে আলী ইবনে আবূ তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। তিনি ঐ সময় পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং খিলাফতের জন্য সর্বাধিক যোগ্য ছিলেন। কিন্তু মানুষের অন্তরসমূহ দ্বিধা-বিভক্ত ও ফিৎনার আগুন প্রজ্বলিত থাকায় তাওহীদী কালিমার নিচে সবাইকে একত্রিত করত একটি সুশৃঙ্খল জামাআত তৈরী করা সম্ভবপর হয়নি। খলীফা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং উম্মাতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ জাতির যে কল্যাণ করতে চেয়েছিলেন তা তারা করতে সক্ষম হননি। এই দলাদলি এবং ফিৎনাতে বিভিন্ন কওম ও জাতি অংশ গ্রহণ করে। ফলে যা ঘটার তাই ঘটেছে।[৯৫]

আলী এবং মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর মাঝে লড়াইয়ে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের অজুহাত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

و مُعاوِيةُ لمْ يدّعِ الخِْلافة ، ولمْ يُبايعْ لهُ بِها حيْن قاتل علِيًّا، ولمْ يُقاتِلْ على أنّهُ خلِيفةٌ ، ولا أنّهُ يسْتحِقُّ الخِْلافة ، ويُقِرُّون لهُ بِذلِك ، وقدْ كان مُعاوِيةُ يُقِرُّ بِذلِك لِمنْ سألهُ عنْهُ ، ولا كان مُعاوِيةُ وأصْحابُهُ يروْن أنْ يبْتدُوا علِيًّا وأصْحابهُ بِالْقِتالِ ، ولا يعْلُوا ، بلْ لما رأى علِيٌّ رضي الله عنه وأصْحابُهُ أنّهُ يجِبُ عليْهِمْ طاعتُهُ ومُبايعتُهُ, إِذْ لا يكُون لِلْمُسْلِميْنِ إِلّا خلِيفةٌ واحِدٌ, وأنّهُمْ خارِجُون عنْ طاعتِهِ يمْتنِعُون عنْ هذا الْواجِبِ, وهُمْ أهْلُ شوْكةٍ رأى أنْ يُقاتِلهُمْ حتّى يُؤدُّوا هذا الْواجِب, فتحْصُل الطّاعةُ والجْماعةُ، وهُمْ قالُوا: إِنّ ذلِك لا يجِبُ عليْهِمْ, وإِنّهُمْ إِذا قُوتِلُوا على ذلِك كانُوا مظْلُومِين قالُوا: لِأنّ عُثْمان قُتِل مظْلُومًا بِاتِّفاقِ

[৯৫] মাজমূউল ফতোওয়া ২৫/৩০৪-৩০৫।

الْمُسْلِمِين, وقتلتُهُ فِي عسْكرِ علِيٍّ, وهُمْ غالِبُون لهُمْ شوْكةٌ, فإِذا امْتنعْنا ظلمُونا واعْتدوْا عليْنا، وعلِيٌّ لا يُمْكِنُهُ دفْعُهُمْ, كما لمْ يُمْكِنْهُ الدّفْعُ عنْ عُثْمان; وإِنّما عليْنا أنْ نُبايِع خلِيفةً يقْدِرُ على أنْ يُنْصِفنا ويبْذُل لنا الْإِنْصاف.

আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে যুদ্ধের সময় মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খিলাফতের দাবি করেননি এবং খিলাফতের জন্য কেউ তার কাছে বায়আতও গ্রহণ করেননি। মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খলীফা হিসাবে লড়াই করেননি, আর নিজেকে তখন খলীফার যোগ্যও মনে করতেন না, মুয়াবিয়ার সাথীরা তার ব্যাপারে এ বিশ্বাসই করতেন। মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কোন এক ব্যক্তির প্রশ্নোত্তরে উপরোক্ত কথাগুলোই বলেন। মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং তার সাথীরাও প্রথমে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং তার দলের সাথে লড়াই শুরু করে তাদের বিরুদ্ধে প্রাধান্য বিস্তার করতে চাননি। বরং যখন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং তার সাথীগণ দেখলেন যে, মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং তার সাথীদের ওপর ওয়াজিব হলো: আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর আনুগত্য করা এবং তার নিকটে বায়আত গ্রহণ করা। কারণ একই সাথে মুসলমানদের একাধিক খলীফা থাকা ঠিক নয়। অথচ মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও তার সাথীরা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর আনুগত্য স্বীকার করে বায়আত গ্রহণ করছে না। তাই আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাদের সাথে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন যাতে তারা তার বায়আত গ্রহণ করত আনুগত্য করে এবং মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। অপর দিকে মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং তার সাথীরা বলেন এ বায়আত আমাদের ওপর ওয়াজিব নয়। এমতাবস্থায় নিহত হলে তারা হবেন মজলুম (অত্যাচারিত)। কারণ, সকল মুসলমানদের ঐকমত্যে উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মজলুম অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন। আর তার হত্যাকারীরা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর দলে রয়েছে। তারাই আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর দলে শক্তিধর ও প্রাধান্য বিস্তারকারী। যখন আমরা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাতে বায়আত করা থেকে বিরত থাকলাম তখন তারা আমাদের ওপর যুলুম করে আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করল। আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর পক্ষে তাদেরকে বাধা দেয়া সম্ভবপর ছিল না যেমন, উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যার ব্যাপারে তিনি তাদেরকে প্রতিহত করতে পারেননি। এমতাবস্থায় আমাদের কর্তব্য হলো এমন একজন খলীফার হাতে বায়আত গ্রহণ করা যিনি আমাদের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।[৯৬]

---

[৯৬] মাজমূ' ফতোওয়া ৩৫/৭২-৭৩।

যে মতবিরোধ এবং ফিৎনার কারণে সাহাবায়ে কিরামের মাঝে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সে বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নীতি দু'টি বিষয়ে সীমাবদ্ধঃ

প্রথম বিষয়ঃ সাহাবাগণের মাঝে যে মতবিরোধ ও লড়াই সংঘটিত হয়েছে সে বিষয়ে তারা কথা বলা, মন্তব্য পেশ ও দোষ-ক্রুটি খোঁজা থেকে বিরত থাকেন। কারণ এরূপ ঘটনাবলিতে চুপ থাকাই শান্তির পথ। তারা সাহাবাগণের ব্যাপারে নিম্নোক্ত দুআ করেনঃ

﴿رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ﴾

তারা বলেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়। *সূরা আল হাশর ৫৯: ১০।*

দ্বিতীয় বিষয়ঃ সাহাবাগণকে দোষারোপ করে যা কিছু বলা হয়েছে তার প্রতিবাদ ও উত্তর প্রদান করা। তা কয়েকভাবে হতে পারেঃ

এক। সাহাবাগণকে দোষারোপ করে বর্ণিত অধিকাংশ রিওয়াতসমূহ বানোয়াট ও মিথ্যা। শত্রুপক্ষ সাহাবাদের সুখ্যাতিকে ম্লান ও কালিমাযুক্ত করতে তাদের নামে এসব মিথ্যা বানিয়ে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

দুই। এ সকল বর্ণনার অনেকগুলোতে সংযোজন-বিয়োজন করে তার বিশুদ্ধতা নষ্ট করা হয়েছে এবং তাতে মিথ্যা যুক্ত হয়েছে। ফলে এসব বর্ণনাকে গুরুত্ব দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

তিন। এ বিষয়ে বিশুদ্ধ রেওয়ায়াত থাকলেও তার সংখ্যা খুবই কম। তার পরও এ ক্ষেত্রে সাহাবাগণের শারঈ ওযর রয়েছে। কারণ এটা ইজতেহাদী বিষয়। এ বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত সঠিকও হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে। মুজতাহিদ ব্যক্তির সিদ্ধান্ত সঠিক হলে তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। আর তিনি যদি ভুলও করেন তবে তার জন্য একভাগ সওয়াব রয়েছে এবং তার ভুল আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন। এ বিষয়ে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

যখন কোন বিচারক ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন তখন তার জন্য দু'টি নেকী রয়েছে এবং যখন বিচার কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে ইজতিহাদ করে ভুল করলেও তার জন্য একটি নেকী লিখা হয়।[৯৭]

চার। সাহাবাগণ মানুষ ছিলেন, মানুষ হিসাবে তাদের ভুল হতেও পারে। কেননা, ব্যক্তিগতভাবে তারা নিষ্পাপ (পাপমুক্ত) নন। তবে তাদের দ্বারা ভুল হলেও তা মোচনের অনেক দিক রয়েছে:

১। এ ভুল থেকে তারা তাওবা করেছেন। আর বিভিন্ন দলীল দ্বারা এ কথা স্পষ্ট যে, তাওবা সকল গুনাহ ও পাপকে মুছে দেয়।

২। তারা ছিলেন ইসলাম, হিজরত ও অন্যান্য সৎকাজে অগ্রগামী এবং তাদের রয়েছে এমন বিশাল মর্যাদা যা তাদের ভুল-ভ্রান্তি মুছে দেয়াকে আবশ্যক করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ﴾

নিশ্চয় নেকীর কাজসমূহ পাপরাশিকে মুছে দেয়। *সূরা হুদ ১১:১১৪।*

তারা ছিলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথী, তারা তার সাথে যুদ্ধ করেছেন। এটা তাদের আংশিক বা ছোট গুনাহসমূকে ঢেকে দেয়।

৩। অন্যদের তুলনায় তাদের নেকীসমূহকে বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়। মর্যাদার দিক দিয়ে তাদের সমতুল্য কেউ হতে পারে না।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী দ্বারা প্রমাণিত তারা হলেন, সর্বোত্তম সোনালীর যুগের লোক। তাদের কারো এক মুদ (৫১০ গ্রাম) পরিমাণ দান অন্যদের ওহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ দানের চেয়েও উত্তম।[৯৮]

আল্লাহ তা'আলা সকল সাহাবাগণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকেও তিনি সন্তুষ্ট করুন। আমীন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (رحمه الله) বলেন: সকল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত এবং দীনের ইমামগণ কোন সাহাবী, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবার ও নিকটাত্মীয়, অগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী এবং অন্য কাউকে নিষ্পাপ বলে বিশ্বাস করেন না। বরং তাদের বিশ্বাস

---

[৯৭] সহীহ বুখারী হা/৭৩৫২, সহীহ মুসলিম হা/১৭১৬।

[৯৮] সহীহ বুখারী হা/৩৬৭৩, সহীহ মুসলিম হা/২৫৪০।

উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা ভুল হতে পারে। তাওবা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের পাপরাশি মোচন এবং মর্যাদা উঁচু করে থাকেন। অনেক সময় মোচনকারী ভালো কাজসমূহ বা অন্য কোন কারণেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدۡقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ ٣٣ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمۡۚ ذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٣٤ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ أَسۡوَأَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ وَيَجۡزِيَهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ ٱلَّذِى كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾

যারা সত্য নিয়ে আগমন করছে এবং সত্যকে সত্য মেনে নিয়েছে; তারাই তো আল্লাহভীরু। তাদের জন্যে পালনকর্তার কাছে তাই রয়েছে, যা তারা চাইবে। এটা সৎকর্মীদের পুরস্কার। যাতে আল্লাহ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের উত্তম কর্মের পুরস্কার তাদেরকে দান করেন। *সূরা আয্ যুমার ৩৯:৩৩-৩৫।* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرۡبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوۡزِعۡنِىٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحًا تَرۡضَىٰهُ وَأَصۡلِحۡ لِى فِى ذُرِّيَّتِىٓۖ إِنِّى تُبۡتُ إِلَيۡكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٥ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنۡهُمۡ أَحۡسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّـَٔاتِهِمۡ فِىٓ أَصۡحَٰبِ ٱلۡجَنَّةِۖ وَعۡدَ ٱلصِّدۡقِ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ﴾

অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এরূপ ভাগ্য দান কর, যাতে আমি তোমার নেয়ামতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম। আমি এমন লোকদের সুকর্মগুলো কবুল করি এবং মন্দকর্মগুলো মার্জনা করি। তারা জান্নাতীদের তালিকাভুক্ত সে সত্য ওয়াদার কারণে যা তাদেরকে দেয়া হত। *সূরা আল্ আহকাফ ৪৬:১৫-১৬।*

ফিৎনার সময় সাহাবাগণের মাঝে যে মতবিরোধ ও লড়াই সংঘটিত হয়েছিল সেটাকে আল্লাহর শত্রুরা সাহাবাগণকে দোষারোপ ও তাদের মানহানির কারণ হিসাবে গ্রহণ করেছে। বর্তমান সময়ের এমন কিছু লেখক এ জঘণ্য পরিকল্পনার ওপর কাজ করে যাচ্ছে যারা এমন সব কথা বলে যা তারা জানে

না। ফলে তারা নিজেদেরকে রসূলে কারীম এর সাহাবাগণের মাঝে বিচারক নির্ধারণ করে দলীল-প্রমাণ বিহীন, বরং অজ্ঞতা ও প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে কতক সাহাবাকে সঠিকপন্থি এবং কতেককে বাতিলপন্থি বলে সিদ্ধান্ত দেয়। এরা প্রাচ্যের হিংসুক, মতলবী এবং তাদের লেজুর-দোসরদের কথাই বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে। ফলে তারা স্বল্প বয়সী ও ইসলামী সংস্কৃতিতে অপরিপক্ক কিছু যুবককে স্বীয় জাতির মর্যাদা সম্পন্ন ইতিহাস এবং উন্নত যুগের সালফে সালেহীন সম্পর্কে সন্দেহে ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

যাতে পর্যায়ক্রমে তারা ইসলামকে কলুষিত-দোষারোপ, মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি, সালফে সালেহীনগণের অনুসরণ ও আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর প্রতি আমল করার পরিবর্তে উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার শেষ যামানার লোকদের হৃদয়ে ইসলামের প্রথম যুগের সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ জাগাতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ﴾

আর এই সম্পদ তাদের জন্যে, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়। *সূরা আল হাশর ৫৯:১০।*

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাহাবায়ে কিরাম এবং দীনের সঠিক পথের ইমামগণকে গালি দেয়া নিষেধ

এক। সাহাবায়ে কিরামকে গালি দেয়া নিষেধ। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অন্যতম মূলনীতি হলো, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের ক্ষেত্রে নিজেদের হৃদয় ও জিহ্বাকে মুক্ত রাখা। অর্থাৎ সাহাবাগণের ক্ষেত্রে তারা কোন মানহানিকর কথা বলেন না। আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের এ গুণই বর্ণনা করেছেন,

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ﴾

আর এই সম্পদ তাদের জন্যে, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়। *সূরা আল্ হাশর ৫৯:১০।*

সাহাবাগণকে গালি না দিলেই রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনুগত্য করা হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ.

তোমরা আমার সাহাবীদিগকে গালি দিও না। কারণ, তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলেও তাদের কারো এক মুদ (৫১০ গ্রাম) বা তার অর্ধেক পরিমাণ দানের সমতুল্যও পৌঁছতে পারবে না।[৯৯]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত নিজেদেরকে রাফেযী ও খারেজীদের নীতি থেকে মুক্ত রাখেন। কারণ রাফেযী ও খারেজীরা সাহাবাগণকে গালি দেয়, তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তাদের মর্যাদাকে অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশকে কাফির বলে বিশ্বাস করে। কুরআন হাদীসে বর্ণিত সাহাবাগণের ফযীলতকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত স্বীকার করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, সাহাবাগণ হলেন উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার সর্বোচ্চ যুগের লোক। যেমন- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

خَيْرُكُمْ قَرْنِي.

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ।[১০০]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাতে মুহাম্মাদীয়া তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে এবং একটি দল ব্যতীত সকল দল জাহান্নামে যাবে মর্মে সংবাদ দিলে সাহাবাগণ এ নাজাত প্রাপ্ত দলটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ

---

[৯৯] সহীহ বুখারী হা/৩৬৭৩, মুসনাদে আহমাদ ১১৬০৮।

[১০০] সহীহ বুখারী হা/২৬৫১, সহীহ মুসলিম হা/২৫৩৫, নাসাঈ হা/৩৮০৯।

هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم و أصحابي.

তারা হলেন ঐসকল লোক যারা আজ আমি এবং আমার সাহাবাগণ যে মত ও পথের ওপর রয়েছি সে পথে চলবে।[১০১]

আবূ যুরআহ্ (রহিমাহুল্লাহ) (তিনি ইমাম মুসলিমের সবচেয়ে সম্মানিত উস্তাদ) বলেন: যখন কোন ব্যক্তিকে কোন সাহাবী সম্পর্কে কটাক্ষ, কটুক্তি বা তার মানহানীকর মন্তব্য করতে দেখবে তখন জানবে সে ব্যক্তি নিশ্চয় নাস্তিক। আর এটা এজন্য যে, আল্ কুরআন সত্য, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য, আর এসকল সত্য বিষয়গুলো সাহাবায়ে কিরামগণই আমাদের নিকটে পৌঁছিয়েছেন। অতএব, যে ব্যক্তি কোন সাহাবীকে দোষারোপ করে সে মূলত কুরআন সুন্নাহ্কে বাতিল করতে চায়। ফলে উল্টো তার দোষী হওয়াই উপযুক্ত। এব্যক্তির উপরে নাস্তিকতা ও পথভ্রষ্টতার হুকুম লাগানো অধিক বিশুদ্ধ ও উপযোগী।

আল্লামা ইব্নে হামদান "নিহাইয়াতুল মুবতাদিঈন" গ্রন্থে বলেন: যে ব্যক্তি কোন সাহাবীকে গালি দেয়া হালাল মনে করবে সে কাফির। আর যদি হালাল মনে না করে কোন সাহাবীকে কেউ গালি দেয় তাহলে সে ফাসিক। তার থেকে অপর বর্ণনাতে এসেছে সাহাবায়ে কিরামকে গালি দাতা কাফির। আর যে ব্যক্তি কোন সাহাবীকে ফাসিক বা কাফির বলবে অথবা তার ধর্মীয় বিষয়ে তাকে দোষারোপ করবে তাহলে সে কাফির এতে কোন সন্দেহ নেই।[১০২]

দুই। উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার সঠিক পথের অনুসারী কোন আলিমকে গালি দেয়া নিষেধ। সাহাবায়ে কিরামের পর সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হলেন এ উম্মাতের সঠিক পথে অবিচল ইমামগণ। তারা হলেন, তাবিঈনগণ এবং মর্যাদাপূর্ণ যুগে তাদের অনুসারীগণ। এরপরের স্থানে রয়েছেন তাবে তাবিঈনগণের পরের যুগে যারা এসেছেন এবং সঠিকভাবে সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ﴾

[১০১] হাসান: তিরমিযী হা/২৬৪১, মুসতাদরাক হাকিম ৪৪৪।

[১০২] শরহে আকীদাতুস্ সাফ্ফারীনী ২/৩৮৮-৩৮৯।

আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। *সূরা আত-তাওবা ৯:১০০*

অতএব, সাহাবাগণকে কটাক্ষ করা এবং তাদেরকে গালি দেয়া জায়িয নয়। কারণ, তারা হিদায়াত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا﴾

যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্য স্থান। *সূরা আন-নিসা ৪:১১৫।*

আকীদা আত তাহাবিয়ার ব্যাখ্যাকার বলেন: আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ভালোবাসা রাখার পর মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ওয়াজিব। কুরআনুল কারীমে এমনটিই বলা হয়েছে। বিশেষত যারা নবীগণের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী (উলামাগণ)। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আকাশের তারকা সমতুল্য করেছেন। যাদের মাধ্যমে জল ও স্থলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যায়। মুসলমানগণ তাদের হিদায়াত প্রাপ্ত ও জ্ঞানী হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। কারণ তারা হলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মাতের মাঝে তার খলীফা বা প্রতিনিধি এবং তার মৃত সুন্নাতগুলোকে জীবিতকারী। তাদের দ্বারা আল্লাহর কিতাব কুরআন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তারাও কুরআনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কুরআন তাদের কথা বলেছে এবং তারাও কুরআন নিয়ে কথা বলেছেন। তারা সকলেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ করা আবশ্যক ও অপরিহার্য বিষয়ে নিশ্চিত একমত। অপর দিকে তাদের কারো কোন কথা যদি সহীহ হাদীসের বিপরীত হয় তবে তা পরিত্যাগে ঐ সাহাবীর কোন না কোন ওযর বা কৈফিয়ত রয়েছে। আর সে ওযরগুলো তিন ধরনের হতে পারে:

১। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বলেছেন বলে তিনি বিশ্বাস করতেন না।

২। তিনি এ বিশ্বাস করতেন না যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা দ্বারা এ মাসআলা উদ্দেশ্য করেছেন।

৩। তিনি উক্ত মাসআলায় এ বিশ্বাস করতেন যে, এ বিধান মানসূখ (রহিত) হয়েছে।

সাহাবাগণ আমাদের অগ্রবর্তী হওয়া, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা আমাদের নিকটে পৌঁছানো এবং তার অস্পষ্ট বিষয়াবলি আমাদের নিকটে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে তারা আমাদের ওপর মর্যাদাশীল ও দয়া পরবশ। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করেছেন। আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী মুমিনদের সম্পর্কে বলেন:

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ﴾

আর এই সম্পদ তাদের জন্যে, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে: হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়। *সূরা আল্ হাশর ৫৯:১০।*

ইজতিহাদী বিষয়ে কোন আলেমের পক্ষ থেকে ভুল সংঘটিত হওয়ার দরুন তার সম্মানহানী করা বিদআতীদের কাজ। এটা দীন ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি, মুসলমানদের মাঝে শত্রুতা তৈরী, উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার পরবর্তী লোকদেরকে পূর্ববর্তী লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা, যুবক এবং আলিমগণের মাঝে বিরোধ প্রসারের জন্য ইসলামের শত্রুদের চক্রান্ত। যেমনটি আজ বর্তমান সমাজে পরিলক্ষিত হয়। অতএব কতেক প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা যেন ফকীহ-মুফতী ও ইসলামী ফিকাহ এর মানহানী না করে। ইসলামী ফিকাহ্ অধ্যয়ন এবং তাতে যে সত্য ও বিশুদ্ধতা রয়েছে তার মাধ্যমে উপকার গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করা থেকে যেন সাবধান, সতর্ক ও বিরত থাকে। এসকল প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা যেন নিজেদের ফিকাহ নিয়ে সম্মানবোধ করে এবং স্বীয় আলিমগণকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। তারা যেন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও পথভ্রষ্ট পথের দাওয়াত দাতাদের মাধ্যমে ধোঁকায় না পড়ে। আল্লাহ সকল ভালো কাজে সহায় হোন। আমীন।

চতুর্থ অধ্যায়

বিদআত পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ: বিদআতের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও বিধান

১। বিদআতের সংজ্ঞা (تعريف البدعة): বিদআতের আভিধানিক সংজ্ঞা: বিদআত শব্দটি আরবী اَلْبَدْعُ (আল্ বাদ্উ) শব্দ হতে গৃহিত। যার অর্থ হলো পূর্ব নমুনা ব্যতীত কোন কিছু আবিষ্কার করা। যেমন-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾

পূর্ব কোন নমুনা ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন। *সূরা আল-বাকারা ২: ১১৭।* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ﴾

তুমি বলে দাও, আমি নতুন কোন রসূল নই। *সূরা আল-আহকাফ ৪৬: ৯।*

অর্থাৎ আমিই সর্ব প্রথম আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বান্দাদের নিকটে রিসালাত নিয়ে এসেছি এমনটি নয়, বরং আমার পূর্বেও অনেক রসূল (আলাইহিমুস্সালাম) এসেছিলেন। বলা হয় অমুক ব্যক্তি একটা বিদআত করেছে, তার অর্থ হলো: সে নতুন একটা পদ্ধতি চালু করেছে যা এর আগে কেউ করেনি।

শাব্দিক অর্থে বিদআত দু'প্রকার:

১। অভ্যাসগত (পার্থিব) বিষয়ে বিদআত। যেমন নব আবিষ্কৃত বস্তুসমূহ, এগুলো বৈধ। কেননা অভ্যাসের ক্ষেত্রে মূল হলো বৈধতা।

২। দীনের ক্ষেত্রে বিদআত, আর এটা হারাম। কেননা এ ক্ষেত্রে আসল হলো তাওকীফী বা প্রতিটি বিষয় কুরআন-হাদীসের দলীলের ওপর নির্ভরশীল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.

যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মের মাঝে এমন কিছু নতুন সংযোজন করে যা তার অন্তর্গত নয় তা পরিত্যাজ্য।[১০৩] অপর বর্ণনায় এসেছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদের দীনে (ইসলাম) নেই তা প্রত্যাখ্যাত।[১০৪]

২। **বিদআতের প্রকারভেদ:** দীনের ক্ষেত্রে বিদআত দু'প্রকার:

প্রথম প্রকার: কথার ক্ষেত্রে যা আকীদাগত বিদআত। যেমন জাহ্‌মিয়্যাহ, মু'তাযিলা, রাফিদা এবং অন্যান্য ভ্রষ্ট দলসমূহের কথা ও আকীদাসমূহ।

দ্বিতীয় প্রকার: ইবাদতের ক্ষেত্রে বিদআত। যেমন এমন বিষয়াবলির মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা যা আল্লাহ তা'আলা শরীআত সম্মত করেননি, এ প্রকার বিদআত আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত:

(১) মূল ইবাদতের মাঝে বিদআত: এমন ইবাদত শরীআতে যার কোন আসল বা অস্তিত্ব নেই। যেমন নতুন কোন সালাত অথবা শরীআত বহির্ভূত কোন সিয়াম, অথবা শরীআত বহির্ভূত কোন ঈদ, যেমন ঈদে মিলাদুন নাবী, মিলাদ মাহফিল ইত্যাদি প্রবর্তন করা।

(২) শরীআত সম্মত ইবাদতে কোন কিছু বৃদ্ধি করা: যেমন যুহর অথবা আসরের সলাতে এক রাকআত বৃদ্ধি করে পাঁচ রাকআত পড়া।

(৩) শরীআত সম্মত ইবাদত আদায়ের পদ্ধতিতে বিদআত: আর তা হলো শরীআত বহির্ভূত পদ্ধতিতে কোন ইবাদত আদায় করা। যেমন, দলবদ্ধভাবে উঁচু শব্দে যিকির করা অথবা ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজের আত্মার ওপর এমন কঠোরতা করা যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতে নেই।

(৪) শরীআত সম্মত ইবাদতের জন্য কোন সময় নির্ধারণ করা যা শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত নয়: যেমন ১৫ ই-শা'বানের দিনে সিয়াম পালন এবং রাত্রে কিয়াম (সালাত আদায়) করা। মূলত সিয়াম ও কিয়াম (রাত্রিকালীন সালাত) শরীআত সম্মত ইবাদত। কিন্তু তার জন্য নির্দিষ্ট

---

[১০৩] সহীহ বুখারী হা/২৬৯৭, আবূ দাউদ হা/৪৬০৬।

[১০৪] সহীহ মুসলিম হা/১৭১৮।

কোন সময়কে নির্দিষ্ট করতে অবশ্যই দলীলের প্রয়োজন (যা শবে বরাত নামক ইবাদতের ক্ষেত্রে নেই)।

৩। দীনের ক্ষেত্রে বিদআতের হুকুম বা বিধান: দীনের ব্যাপারে সকল প্রকার বিদআত হারাম ও ভ্রষ্টতা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

দীনের মাঝে তোমরা নতুন কিছু সংযোজন করা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে। কেননা দীনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নতুন জিনিসই বিদআত আর প্রত্যেক বিদআত হলো গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা।[১০৫]

অপর হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.

যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনের মাঝে এমন নতুন কিছু সংযোজন করে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তা পরিত্যাজ্য।[১০৬] অপর বর্ণনায় রয়েছে:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদের দীনে নেই তা প্রত্যাখ্যাত।[১০৭]

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে বুঝা যায় দীনের মাঝে প্রত্যেক নতুন জিনিসই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা ও প্রত্যাখ্যাত। অর্থাৎ ইবাদত ও আকীদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিদআত হারাম বা নিষিদ্ধ। তবে এর প্রকারভেদে নিষিদ্ধতার মাত্রা কম-বেশি হয়ে থাকে।

তার মধ্যে কিছু স্পষ্ট কুফরী। যেমন কবরস্থ ব্যক্তির নৈকট্য লাভের আশায় তার কবরকে তওয়াফ করা, কবরস্থ ব্যক্তির নিকটে দুআ করা, সাহায্য প্রার্থনা করা এবং গুলাতুল (বাড়াবাড়িকারী) জাহমিয়্যাহ্ ও মুতাযিলাদের উক্তি সমূহ। আর কিছু বিদআত রয়েছে যা শিরকে নিমজ্জিত করার মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। যেমন কবরের ওপর কোন কিছু নির্মাণ করা, সেখানে সালাত আদায় ও দুআ করা।

---

[১০৫] সহীহ: আবূ দাউদ হা/৪৬০৭, নাসাঈ ১৫৭৮, সহীহ ইবনে খুযাইমা হা/১৭৮৫।

[১০৬] সহীহ বুখারী হা/২৬৯৭, আবূ দাউদ হা/৪৬০৬।

[১০৭] সহীহ মুসলিম হা/১৭১৮।

কিছু বিদআত রয়েছে যা আকীদার ক্ষেত্রে ফাসিকী হিসাবে গণ্য। যেমন খারিজী, কাদারিয়াহ্ ও মুরজিয়াদের আকীদা এবং উক্তির ক্ষেত্রে বিদআত যা শারঈ দলীলের বিপরীত। কিছু বিদআত আছে যা পাপকার্য (অবাধ্যতা) হিসাবে গণ্য। যেমন সন্তান না নেয়ার জন্য খাসি করে নেয়া, সূর্যে দাঁড়িয়ে সিয়াম পালন করা এবং সহবাসের চাহিদা নষ্ট করার জন্য খাসি হয়ে যাওয়া।[১০৮]

একটি সতর্কতা : বিদআতকে হাসানা ও সাইয়িআহ হিসাবে ভাগ করা

যে ব্যক্তি বিদআতকে বিদআতে হাসানা ও সাইয়িআতে (ভালো ও মন্দ বিদআতে) বিভক্ত করবে; সে ভুল করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নোক্ত হাদীসের বিরোধীতা করবে: «فإن كل بدعة ضلالة» প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা বা গুমরাহী। কেননা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল বিদআতকে ভ্রষ্টতা বলে উল্লেখ করেছেন।

আর কতেক মানুষ কি না বলছে! প্রত্যেক বিদআত ভ্রষ্টতা নয় বরং এক প্রকার বিদআত রয়েছে যা বিদআতে হাসানা বা উত্তম বিদআত!!!

হাফিয ইবনে রজব (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসে আরবাঈনের (চল্লিশ হাদীসের) ব্যাখ্যায় বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: «كل بدعة ضلالة» 'সকল প্রকার বিদআত ভ্রষ্টতা' এটি অল্প কথায় বিস্তৃত তাৎপর্য ও বহুল অর্থবোধক বাক্যের অন্তর্ভুক্ত। যা থেকে কোন বিদআতই বাদ পড়েনি। এটা দীন ইসলামের অন্যতম মূলনীতি এবং রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাণী:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.

'আমাদের দীনের অন্তর্গত নয় এমন কিছু যে তাতে সংযোগ করে তা প্রত্যাখ্যাত' এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

অতএব যারাই দীনের মধ্যে এমন নতুন কিছু সংযোজন করে যে ব্যাপারে দলিল-প্রমাণ নেই; তা ভ্রষ্টতা, দীন তা থেকে মুক্ত।

---

[১০৮] ইমাম শাতুবীর লেখা আল্ ই'তিসাম গ্রন্থ ২/৩৭।

এ ধরনের বিষয় আকীদা (বিশ্বাস), প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য কথা ও কাজসহ সকল মাসআলার ক্ষেত্রেই হতে পারে।[১০৯]

তারাবীহ সালাতের ক্ষেত্রে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর উক্তি: [نعمت البدعة هذه] (এটা কতই না উত্তম বিদআত) ব্যতীত এ সকল লোকদের (যারা বিদ'আতে হাসানা ও সাইয়িআহ বলে) আর কোন দলীল নেই। তারা আরো বলে: অনেক নতুন জিনিসই করা হয়েছে পূর্ববর্তী সালাফ বা সৎ ব্যক্তিগণ তার বিরোধিতা করেননি। যেমন: কুরআন সংকলন করা এবং হাদীস লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি।

এর উত্তর হল: ইসলামী শরীআতে এ সকল কাজের মূল ভিত্তি রয়েছে, তাই তা নতুন নয়, আর উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কথা: ﴿نعمت البدعة هذه﴾ দ্বারা তিনি শাব্দিক অর্থে বিদআত বুঝিয়েছেন, শারঈ অর্থে নয়, শরীআতে যার মূল রয়েছে সে দিকেই ফিরে যেতে হবে। যদি বলা হয় জামাআতে তারাবীর সালাত আদায় বিদআত, তবে তা শাব্দিক অর্থে বিদআত, শারঈ অর্থে নয়।

কেননা, শারঈ অর্থে বিদআত হলো: দীনের মাঝে এমন কিছু নতুন সংযোজন করা শরীআতে যার কোন মূল ভিত্তি নেই। আর কুরআনুল কারীম এক কিতাবে একত্রে জমা করার মূল ভিত্তি ইসলামে রয়েছে। কেননা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন লিখার জন্য সাহাবাগণকে আদেশ করতেন। তবে কুরআন বিভিন্ন স্থানে লিপিবদ্ধ ছিল, তাই কুরআন সংরক্ষণের জন্য সাহাবাগণ তা একত্রে জমা করেন। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবাগণকে নিয়ে কয়েক রাত তারাবীর সালাত জামাআতে আদায় করেছেন, পরবর্তীতে ফরয হওয়ার ভয়ে তিনি আর তা করেননি। সাহাবাগণ রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পর পৃথক পৃথকভাবে এ সালাত আদায় করতেন। পরবর্তীতে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাদেরকে এক ইমামের পিছনে একত্রিত করেন, যেমনটি তারা রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছনে একত্রে কয়েক রাত সালাত আদায় করেছিলেন। তাই প্রমাণিত হলো যে একত্রে তারাবীর সালাত আদায় করা বিদআত বা দীনের মাঝে নবাবিষ্কৃত কোন বিষয় নয়।

হাদীস লিপিবদ্ধ ও সংকলনের মূল ভিত্তিও শরীআতে বিদ্যমান। যখন কোন সাহাবী রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট কোন হাদীস লিখে নিতে চাইতেন তখন তিনি তা লিখে দেয়ার আদেশ দিতেন।

---

[১০৯] জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম ২৩৩ পৃষ্টা।

আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নাবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশাতেই হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন। তবে কুরআনের সাথে মিলে যাওয়ার ভয়ে রসূলের জীবদ্দশায় ব্যাপকভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করা নিষেধ ছিল। যখন তিনি ইন্তিকাল করলেন তখন এ ভয় দূর হয়ে গেল। কেননা, কুরআন পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল এবং রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকালের পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ সময়ে হাদীস নষ্ট না হয়ে সংরক্ষিত রাখার জন্য মুসলমানগণ হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। যারা এ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন; কেননা, তারা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসকে নষ্ট হওয়া ও বাতিলদের বাতুলতা ও অনর্থকতা থেকে সংরক্ষণ করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ মুসলিম সমাজে বিদআতের প্রকাশ ও তার কারণ

১। মুসলিম সমাজে বিদআতের প্রকাশঃ

প্রথমতঃ বিদআত প্রকাশের সময়কাল।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ জেনে রেখো, ইলম ও ইবাদতের ক্ষেত্রে উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ায় সর্বপ্রথম সাধারণ বিদআত প্রকাশ পায় খোলাফায়ে রাশেদার শেষ যুগে।[১১০] আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ.

তোমাদের যারা আমার পরে জীবিত থাকবে তারা অতিসত্ত্বর অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার ও হিদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদার (চার খলীফার) পথ ও সুন্নাতকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে।[১১১]

সর্বপ্রথম যে সকল বিদআত প্রকাশ পায় তা হলোঃ

- কাদরিয়া, মুরজিয়া, শিয়া ও খারিজীদের বিদআত।

---

[১১০] মাজমুউ'ল ফতোয়া ১০/৩৫৪।

[১১১] সহীহঃ আবু দাউদ হা/৪৬০৭।

- উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর শাহাদাতের পর দলাদলি শুরু হলে হারুরিয়া নামক বিদআতী দলের আবির্ভাব ঘটে।
- ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস, জাবির প্রমুখ সাহাবাগণের শেষ যুগে কাদরিয়া নামক বাতিল দলের আবির্ভাব ঘটে। এর কাছাকাছি সময়ে মুরজিয়া নামক ফের্কার উদ্ভব হয়।
- উমর ইবনে আব্দুল আযীযের মৃত্যুর পর তাবিঈগণের শেষ যুগে জাহমীয়া নামক দলের প্রকাশ ঘটে। এমনও বর্ণিত আছে যে, উমার ইবনে আব্দুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) জাহমীয়াদের ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। মূলত খলীফা হিশাম ইবনে আব্দুল মালিকের যুগে খোরাসানে জাহমীয়ারা আত্মপ্রকাশ করে।
- হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে এ সকল বিদআতের সূচনা হয়। তখন অনেক সাহাবী বেঁচে ছিলেন, তারা এ সব বিদআত প্রবর্তনকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করেছেন। এরপর মুতাযিলা নামক নতুন দলের প্রকাশ হয়।
- তখন মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন ফিতনা সৃষ্টি হয়। মানুষ মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে বিদআত ও প্রবৃত্তির প্রতি আসক্ত হতে শুরু করে। উত্তম তিন যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর সুফীবাদ, কবর পাকাকরণ ও তার ওপর গম্বুজ ইত্যাদী নির্মাণের মত বিদআতের প্রকাশ ঘটে। এভাবে সময় যত গড়িয়েছে বিদআতও বেশি হয়েছে এবং নতুন নতুন আকার ধারণ করেছে।

দ্বিতীয়তঃ বিদআত প্রকাশের স্থান।

বিদআত প্রকাশের ক্ষেত্রে ইসলামী শহরগুলোর ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

বড় বড় শহর যেগুলোতে সাহাবাগণ বসবাস করেন এবং যেখান থেকে ইলম ও ঈমানের প্রকাশ ঘটে তা পাঁচটিঃ হারামাইন (মক্কা-মদীনা), দুই ইরাক (বসরা-কুফা) এবং শাম (সিরিয়া)।

কুরআন, হাদীস, ফিকহ, ইবাদত এবং অন্যান্য ইসলামী মাসআলা এসকল শহর হতে প্রকাশ পেয়েছে। অপর দিকে মক্কা-মদীনা ব্যতীত এসকল শহর থেকেই মূল বিদআত চালু হয়। কুফা থেকে শিয়া এবং মুরজিয়াদের বিদআত চালু হয়ে অন্যত্রে তা বিস্তার লাভ করে। বসরা থেকে কাদরিয়া ও মুতাযিলা মতবাদ এবং অন্যান্য বাতিল কর্মাদি চালু হয়ে পরবর্তীতে তা অন্যত্র বিস্তার করে। শাম বা সিরিয়াতে নাসাবিয়া ও কাদরিয়াদের প্রাদুর্ভাব ছিল।

জাহ্মিয়াদের বিদআত খোরাসানের দিকে প্রকাশ পায় এবং তা হলো সবচেয়ে খারাপ বিদআত। বিদআত প্রকাশ হতে নাবীগৃহ বেশ দূরেই ছিল।

কিন্তু উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর শাহাদাতের পর মতভেদ সংঘটিত হলে মদীনাতে হারুরিয়া মতবাদের লোকদেরকে দেখা যায়। তবে মদীনা মুনাওয়ারাহ এ সকল বিদআত হতে মুক্ত বা নিরাপদ ছিল। এটা সত্য যে, মদীনাতে কিছু লোক গোপনে বিদআত করত তবে তারা লাঞ্ছিত ও নিন্দিত ছিল। যেমন সেখানে কাদরিয়াদের একটা দল ও অন্যান্য কিছু বিদআতপন্থি লোক থাকলেও তারা অপদস্থ ও নিচু হয়েই ছিল।

অপরদিকে কুফাতে শিয়া ও মুরজিয়া, বসরাতে মুতাযিলা ও নুস্সাকদের (বাতিল পন্থায় ইবাদতকারী) বিদআত এবং শাম বা সিরিয়াতে নাসাবিয়াদের বিদআত স্পষ্ট ও প্রকাশ্যরূপে ছিল। সহীহ হাদীসে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: দাজ্জাল মদীনাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[১১২] ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) এর অনুসারীদের পর্যন্ত সেখানে ইলম ও ঈমান স্পষ্ট ছিল। অথচ তারা ছিলেন চতুর্থ শতাব্দীর লোক।[১১৩]

উত্তম তিন যুগে মদীনাতে প্রকাশ্য কোন বিদআত ছিল না এবং দীনের মূলনীতির ক্ষেত্রে সেখান থেকে কোন বিদআতের সূচনা হয়নি, যেমনটি অন্যান্য শহর থেকে হয়েছে।

২। বিদআত প্রকাশের কারণসমূহ: এতে সন্দেহ নেই যে কুরআন সুন্নাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরাতেই বিদআত ও গোমরাহী হতে মুক্তি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦۚ﴾

এটাই আমার সহজ সরল পথ। তোমরা এ পথেরই অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথ ও মতের অনুসরণ করিও না; তাহলে তা তোমাদিগকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। *সূরা আল্ আনআম ৬: ১৫৩।*

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বিষয়টি ঐ হাদীসে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যা ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

---

[১১২] সহীহ বুখারী ১৮৭৯।

[১১৩] মাজমু' ফতোয়া ২০/৩০০-৩০৩।

خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال: "هذا سبيل الله" ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: "وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه" ثم تلا {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً} إلى آخر الآية [الأنعام: ١٥٣]

একদা তিনি আমাদের জন্য একটি দাগ কেটে বা টেনে বললেন: "এটা আল্লাহর পথ"। তার পরে ঐ দাগের ডানে-বামে কয়েকটি দাগ টেনে বললেন: আর এ সকল পথ এমন যার প্রতিটির মাথায় একটা করে শয়তান রয়েছে যে নিজের দিকে এবং ঐপথের দিকে মানুষকে আহ্বান করছে, এরপর তিনি আল্লাহর এ বাণী পাঠ করলেন:

{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام: ١٥٣]

নিশ্চয় এটাই আমার সহজ সরল পথ। তোমরা এ পথেরই অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথ ও মতের অনুসরণ করিও না; তাহলে তা তোমাদিগকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে, আল্লাহ তোমাদেরকে এর অসিয়তই করেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।[১১৪]

অতএব, যারা কুরআন সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তারাই ভ্রষ্টপথে এবং নবাবিষ্কৃত বিদআতসমূহে নিপতিত হবে।

বিদআত প্রকাশের মূল কারণসমূহ

বিদআত প্রকাশের মূল কারণগুলো সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে পেশ করা হল:

দীনের বিধিবিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা, প্রবৃত্তির অনুসরণ, বিভিন্ন মত ও ব্যক্তির প্রতি গোঁড়ামী, কাফেরদের সাথে সাদৃশ্যতা পোষণ ও তাদের অন্ধ অনুসরণ করা ইত্যাদী।

নিম্নে এ বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আমরা তুলে ধরা হলো:

(ক) দীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা: রিসালাতের যুগ যতই অতিক্রান্ত হয়েছে মুসলিম সমাজ তা থেকে ততই দূরে সরে গেছে। পক্ষান্তরে ইলমের ঘাটতি ও মূর্খতার প্রসার হয়েছে। যেমন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে,

---

[১১৪] সহীহ: মুসনাদে আহমাদ ১৫২৭৭, সহীহ ইবনে হিব্বান ৬ ও হাকিম ৩২৪১।

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا.

তোমাদের মধ্যে যারা দীর্ঘজীবি হবে (বেঁচে থাকবে) তারা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে।[১১৫] অন্যত্রে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

আল্লাহ মানুষের নিকট থেকে ইলম ছিনিয়ে নিবেন না। তবে তিনি ইলম ছিনিয়ে নিবেন আলিমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে, এমনকি যখন কোন আলিম বাকী (জীবিত) থাকবে না, মানুষেরা তখন অজ্ঞ ও মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। তারা যখন জিজ্ঞাসিত হবে তখন বিনা ইলম বা জ্ঞানে ফতোয়া দিবে, ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং মানুষদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।[১১৬]

ইল্‌ম ও আলিমগণ ব্যতীত বিদআতের মোকাবিলা করা এবং তা সংশোধন করা সম্ভব নয়। যখন ইল্‌ম ও আলিম পাওয়া যাবে না তখন বিদআত নির্দ্বিধায় প্রকাশ ও প্রসার হতে পারবে এবং বিদআতীরাও উদ্যমতা ও শক্তি লাভ করবে।

(খ) প্রবৃত্তির অনুসরণ: যে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে নিজ প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ﴾

অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হিদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? *সূরা আল ক্বাসাস ২৮: ৫০।* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ﴾

---

[১১৫] সহীহ: ইবনে মাজাহ হা/৪৩, সহীহ ইবনে হিব্বান হা/৫ ও তিরমিযী হা/৬৯।

[১১৬] সহীহ মুসলিম হা/২৬৭৩, তিরমিযী হা/২৬৫২।

আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল খুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন। তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের ওপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? *সূরা আল-জাসিয়া ৪৫: ২৩।* বিদআত হলো অনুসৃত প্রবৃত্তির নির্যাস।

(গ) বিভিন্ন মত ও ব্যক্তির প্রতি গোঁড়ামী: ব্যক্তি বিশেষ বা কারো কোন মতের প্রতি গোঁড়ামী মনোভাব সঠিক দলীলের অনুসরণ ও সত্য জানার পথে বাধার সৃষ্টি করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ﴾

আর যখন তাদের বলা হয়, 'তোমরা তাই অনুসরণ করো, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন'। তখন তারা বলে, না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব, যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। *সূরা আল্-বাকারা ২: ১৭০।*

বর্তমানে গোঁড়া লোকদের ব্যাপারটি এমনই। সুফী ও কবর পূজারীদের কোন দলকে যখন কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ এবং কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী যে আমলের ওপর তারা রয়েছে তা পরিত্যাগের দাওয়াত দেয়া হয়, তখন তারা নিজেদের মাযহাব, নেতা ও বাপ-দাদার থেকে দলীল দেয়।

(ঘ) কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য: কাফিরদের সাথে সাদৃশ্যতা পোষণ ও সামঞ্জস্যতা রক্ষা করণই মানুষকে সবচেয়ে বেশি বিদ'আতে পতিত করে। আবূ ওয়াকিদ আল লাইছি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন:

خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط قال : فمررنا بالسدرة فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل {اجعل لنا إلها كما لهم آلهة } قال : إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم.

আমরা রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে হুনাইনের যুদ্ধে বের হলাম। আমরা ছিলাম কুফরের কাছা-কাছি সময়ের অর্থাৎ আমরা নতুন মুসলমান ছিলাম। মুশরিকদের একটা বরই গাছ ছিল (গুরুত্বপূর্ণ কাজে গেলে) তার নিকটে তারা দাঁড়াত এবং তাতে নিজেদের অস্ত্রগুলো ঝুলিয়ে রাখত। ঐ গাছটির নাম ছিল যাতু আন্‌ওয়াত। আমরাও ঐ সফরে একটা

কুল গাছের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। তখন আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কাফিরদের যেমন একটা যাতু আন্ওয়াত আছে আমাদের জন্যও অনুরূপ একটা যাতু আনওয়াত বৃক্ষ নির্ধারণ করে দিন। তখন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান) সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা পূর্ব অনুসৃত সে পথের কথাই বলছো যা বানী ইসরাঈল মূসা (আলাইহিস সালাম) কে বলেছিল। তারা বলতে লাগল, হে মূসা আলাইহিস সালাম:

﴿ٱجۡعَل لَّنَآ إِلَٰهٗا كَمَا لَهُمۡ ءَالِهَةٞۚ قَالَ إِنَّكُمۡ قَوۡمٞ تَجۡهَلُونَ﴾

আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের মূর্তির মতই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন। তিনি বললেন: তোমাদের মধ্যে বড়ই অজ্ঞতা রয়েছে। *সূরা আল-আ'রাফ ৭: ১৩৮।* অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ.

অবশ্যই পদে পদে তোমরা পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।[১১৭]

অত্র হাদীস থেকে একথা স্পষ্ট যে, কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য রক্ষা করাই বাণী ইসরাঈলকে এ জঘন্য বা নিকৃষ্ট আবেদনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে।

আর তা হলো (কাফিরদের মতো) তাদের জন্যও মা'বূদ নির্বাচন করা যাদের তারা ইবাদত করবে। আর ঠিক এ কারণেই কতক সাহাবাগণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে এ আবেদন করতে উদ্দত হন যাতে করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তিনি তাদের জন্য এমন একটি গাছ নির্ধারণ করে দেন যার মাধ্যমে তারা বরকত লাভ করবে।

বর্তমানের বাস্তবতাও একই রকম। অধিকাংশ মুসলিম বিদআত ও শির্কী কর্মে কাফিরদেরই অন্ধ অনুসরণ করছে। যেমন, জন্মদিন পালন, বিভিন্ন দিবস ও সপ্তাহ পালন [এরূপ সকল বিদআত ইসলামের শত্রুদের থেকে মুসলিম নামধারী অজ্ঞ ব্যক্তিগণ মুসলিম সমাজে প্রচলন করেছে।] বিভিন্ন ধর্মীয় উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানাদি ও স্মরণ সভা পালন, মূর্তী বা ভাস্কর্য তৈরী, স্মৃতিসৌধ নির্মাণ, কোন ব্যক্তির মৃত্যু পরবর্তী শোক অনুষ্ঠান করা, জানাযার বিদআত, কবরের ওপর ঘর ও গম্বুজ নির্মাণ করা ইত্যাদী।

---

[১১৭] সহীহ ইবনে হিব্বান হা/৬৭০২, মুসনাদে আহমাদ ২১৮৯৭।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিদআতীদের ব্যাপারে মুসলিম জাতির অবস্থান এবং তাদের প্রতিবাদে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নীতি

১। বিদআতীদের ব্যাপারে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অবস্থান:

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত সর্বদা বিদআতীদের প্রতিবাদ ও তাদেরকৃত বিদআতকে অস্বীকার করে আসছেন। তাদেরকে এবং অন্যান্য মানুষদেরকে এ বিদআত করা থেকে নিষেধ করে আসছেন। আপনাদের জন্য তার কিছু নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হলো: উম্মুদ দারদা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন:

دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا أَغْضَبَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا.

একদা আবুদ্দারদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাগান্বিত হয়ে আমার নিকটে প্রবেশ করলে আমি তাকে বললাম: কিসে তোমাকে রাগান্বিত করেছে? তিনি বললেন: আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মাতের মাঝে জামাআতে সালাত আদায় করা ব্যতীত আর কোন আমল অবশিষ্ট দেখতে পাচ্ছি না।[১১৮] বিদআতীদের সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর ঘটনা:

عن عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال : كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن اني رأيت في المسجد أنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله الا خيرا قال فما هو فقال ان عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصا فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة فيقول هللوا مائة فيهللون مائة ويقول سبحوا مائة فيسبحون مائة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك قال أفلا أمرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ان لا يضيع من حسناتهم ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك

---

[১১৮] সহীহ বুখারী হা/৬৫০, মুসনাদে আহমাদ হা/২৭৫০০।

الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الله حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ان لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه و سلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وأنيته لم تكسر والذي نفسي بيده انكم لعلي ملة هي أهدي من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا الا الخير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج.

উমার ইবনে ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন: যুহরের সালাতের পূর্বে আমরা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর দরজার সামনে বসে থাকতাম। যখন তিনি বের হতেন তখন আমরাও তার সাথে মাসজিদে সালাত আদায়ের জন্য যেতাম। একদা আমরা ঐভাবে বসেছিলাম, তখন আবূ মূসা আশ'আরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এসে বললেন: আবূ আব্দুর রহমান (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ) কি বের হয়েছেন না তার বের হতে দেরী হবে? আমরা বললাম: না, তিনি বের হননি, তখন তিনিও আমাদের সাথে তার বের হওয়া পর্যন্ত বসে রইলেন। অতঃপর যখন তিনি বের হলেন তখন আমরা সকলে তার সাথে মসজিদে যাওয়ার জন্য দাঁড়ালাম। আবূ মূসা আশআ'রী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: হে আবূ আব্দুর রহমান, আমি এখনি মসজিদে একটি ঘটনা দেখলাম যা আমার নিকটে অপছন্দনীয় এবং অপরিচিত মনে হয়েছে। আল্লাহর প্রশংসা আমি ভালোই দেখলাম, ইবনে মাসঊদ বললেন: সেটা কি? তিনি বললেন: আপনি বেঁচে থাকলে দেখতে পাবেন। আবূ মূসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: আমি মসজিদে কিছু লোককে দেখলাম বৃত্তাকারে বসে সালাতের জন্য অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক বৃত্তে একজন করে ব্যক্তি এবং তাদের সকলের হাতে কাঠি বা কড়ি রয়েছে। ঐ ব্যক্তি বলছে: একশত বার আল্লাহু আকবার বলুন, তখন তারা ঐ কাঁঠি দিয়ে গুনে একশত বার আল্লাহু আকবার বলছে। এরপর সে ব্যক্তি বলছে, একশত বার লা-ইলা-হা বলুন, তখন তারা ঐ নিয়মে তা করছে। এরপর বলছে: একশতবার সুবহানাল্লাহ বলুন, তখন তারা কাঁঠি দিয়ে গুণে একশতবার সুবহানাল্লাহ্ বলছে। ইবনে মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: আপনি তাদেরকে কি বললেন? তিনি বললেন: আপনার রায় বা আদেশের অপেক্ষায় আমি তাদেরকে কিছু বলিনি। ইবনে

মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: আপনি তাদেরকে নিজেদের খারাপ কর্মগুলো গণনা করতে নির্দেশ দিয়ে তাদের কোন সৎকর্ম নষ্ট হবে না এর যামিন বা যিম্মাদর হলেন না কেন? অতঃপর আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মসজিদের দিকে চলা শুরু করলেন আমরাও তার সাথে গেলাম। তিনি মসজিদের ঐ হালকাগুলোর (গোল হয়ে বসাকে হালাকা বলে) নিকটে এসে তথায় দাঁড়িয়ে বললেন: তোমরা এসব কি করছ? তারা বলল: হে আবূ আব্দুর রাহমান এগুলো হলো পাথরখণ্ড যা দিয়ে আমরা তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাহ্লীল (লাইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাসবীহ্ (সুবহানাল্লাহ) এবং তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) গণনা করছি! তিনি বললেন: তোমরা তোমাদের গুনাহগুলো গণনা কর। আমি যিম্মাদার হচ্ছি তোমাদের কোন ভালো আমল হারিয়ে যাবে না। ধ্বংস ও সর্বনাশ তোমাদের হে উম্মতে উম্মাদীয়া! তোমরা এত দ্রুত ধ্বংসের পথে পা বাড়িয়েছো! রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনেক সাহাবী এখনো বেঁচে আছেন! এ হলো তার কাপড় যা নষ্ট হয়ে যায়নি, তার পান পাত্র ভাঙ্গেনি। (আর তোমরা এতদ্রুত বিদ'আতে লিপ্ত হয়েগেছো)। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ তোমরা যে পথের ওপর রয়েছো তা কি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পথ হতে অধিক হেদায়েত প্রাপ্ত? না তোমরা বিদআত বা পথভ্রষ্টতার দরজা উম্মুক্তকারী? তারা বলল: আল্লাহর শপথ হে আবূ আব্দুর রাহমান! কল্যাণ ছাড়া আমরা কিছুই চাইনি। ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: অনেক কল্যাণ কামীই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকে অর্থাৎ কল্যাণ চায় কিন্তু তা অর্জন করতে পারে না। (তোমাদের অবস্থাও তাই!)। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে হাদীস বর্ণনা করেছেন: একটা জাতি হবে যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। আল্লাহর শপথ সম্ভবত তাদের অধিকাংশ তোমাদের মধ্য থেকেই। এরপর তিনি তাদের থেকে ফিরে গেলেন। আমর ইবনে সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: নাহ্রাওয়ানের দিন আমি তাদের অধিকাংশকে খাওয়ারিজদের সাথে মিশে আমাদেরকে গালিগালাজ করছে।[১১৯]

গ। বিদআতীর সাথে ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) এর ঘটনা: কোন এক ব্যক্তি ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহিমাহুল্লাহ) এর নিকটে এসে বলল: আমি কোথা থেকে ইহরাম বাঁধব? তিনি বললেন: ঐ মিকাত (স্থান) গুলো থেকে ইহরাম বাঁধবে যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারণ করেছেন এবং আমি ঐ সব মিকাত থেকেই ইহরাম বাঁধি। তখন ঐ ব্যক্তি বলল: আমি যদি

[১১৯] সুনানে দারিমী হা/২১০। হুসাইন সেলিম আসাদ বলেন, হাদীসটির সনদ ভালো।

মিকাতের চেয়ে দূরবর্তী স্থান হতে ইহরাম বাঁধি? ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) বললেন: আমি তা জায়িয মনে করি না। লোকটি বলল: এতে আপনি খারাপির কি দেখলেন? তিনি বললেন: এর মাধ্যমে তুমি ফিতনায় পড় এটা আমার পছন্দ নয়। লোকটি বলল: কল্যাণকর কাজ বেশি করাতে আবার কিসের ফিতনা রয়েছে? তখন ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) বললেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, ফিতনা (বিপর্যয়) তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। *সূরা আন্-নূর ২৪: ৬৩।*

তুমি এমন এক ফযীলতের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করছ, যা স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অর্জন করতে পারেননি এর চেয়ে বড় ফিতনা বা বিপর্যয় আর কি হতে পারে![১২০] এটা একটা উপমা বা দৃষ্টান্ত মাত্র। আলিমগণ যুগে যুগে বিদ'আতিদের বিরোধীতা করে আসছেন। তাই সকল প্রশংসা আল্লাহর।

২। বিদআতীদের প্রতিবাদে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নীতি:

এক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নীতি কুরআন ও সুন্নাহের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ নীতি সন্তোষজনক, তৃপ্তিকর ও নির্বাককারী (যার পরে আর কোন কথা বলার থাকে না)। তারা বিদআতীদের সংশয়গুলো পেশ করে তা খণ্ডন করেন। সুন্নাতকে অপরিহার্যভাবে গ্রহণ এবং বিদআত ও দীনের মাঝে নবাবিস্কৃত বিষয় থেকে নিষেধের ক্ষেত্রে তারা কুরআন এবং হাদীসের মাধ্যমে দলীল দেন। এ ব্যাপারে তারা অনেক কিতাবও রচনা করেছেন। ঈমানের মূলনীতি ও আকীদার ক্ষেত্রে তারা আকীদার কিতাব সমূহে শিয়া, খাওয়ারিজ, জাহমিয়্যাহ, মুতাযিলা, আশআরীদের বিদআতী মতবাদের খণ্ডন ও প্রতিবাদ করেছেন। এ বিষয়ে তারা স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন কিতাব রচনা করেছেন। যেমন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রচনা করেছেন: জাহমিয়াদের জবাব। অন্যান্য ইমামগণও এ ব্যাপারে কিতাব রচনা করেছেন।

যেমন উসমান ইবনে সাঈদ আদ-দারিমী, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ এবং তার ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম এবং শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে

---

[১২০] ঘটনাটি আবূ শামাহ্ আবূ বকর আল-খাল্লাল থেকে "আল-বায়িস আলা' ইন্কারিল বিদা' অল হাওয়াদিস" কিতাবের ১৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

আব্দুল ওয়াহ্হাব ও অন্যান্য উলামাগণ। প্রত্যেকেই উপরোক্ত বাতিল ফিরকাসমূহ, কবরপূজারী এবং সুফীদের জবাবে কিতাব রচনা করেছেন। বিদআতীদের জবাবে লিখিত কিতাবসমূহ অনেক। এগুলোর মধ্যে প্রাচীন ও সমকালিন কিছু কিতাব নীচে উল্লেখ করা হলো।

পুরাতন কিতাবসমূহঃ কিতাবুল ই'তিসাম (ইমাম শাত্বিবী), কিতাবু ইকতিযাউস্‌সিরাতুল মুস্তাকীম (ইবনে তাইমিয়াহ)। এ কিতাবের বড় একটা অংশে বিদআতীদের প্রতিবাদ করা হয়েছে, কিতাবু ইনকারিল হাওয়াদিছ ওয়াল বিদা' (ইবনে ওজ্জাহ), কিতাবুল হাওয়াদিছ ওয়াল বিদা' (ত্বরত্বশী), কিতাবুল বায়িছ আলা' ইনকারিল বিদা' ওয়াল হাওয়াদিছ (আবূ শামাহ্)

বর্তমান কিতাবসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ কিতাবুল ইবদা' ফী মাযারিল ইবতিদা' (শাইখ আলী মাহফূয), কিতাবুস্ সুনান ওয়াল মুবতাদিআতিল মুতাআ'ল্লিকাতু বিল আযকার ওয়াছ ছালাওয়াত, (শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আশ্ শুকাইরি আল হাওয়ামিদী), রিসালাতু-ত্তাহযীর মিনাল বিদা' (শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায)

আলহামদুলিল্লাহ্ আজও মুসলিম উলামাগণ বিদআতকে প্রত্যাখ্যান করত পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, রেডিও, জুমআর খুৎবা, সেমিনার এবং বক্তব্যের মাধ্যমে বিদআতীদের প্রতিবাদ করে আসছেন। মুসলমানদেরকে বিদআত বিষয়ে সতর্কীকরণ, বিদআতের মূলোৎপাটন এবং বিদআতীদেরকে নির্বাক করে দিতে যার বড় ভূমিকা রয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ বর্তমান যুগে প্রচলিত বিদআতের কিছু নমুনা

১। ঈদে মীলাদুন্নাবী (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে মীলাদ) অনুষ্ঠান করা।

২। বিশেষ কোন স্থান বা নিদর্শনাবলি, কিংবা কোন মৃত ব্যক্তি বা অনুরূপ কোন কিছুর মাধ্যমে বরকত অর্জন করা।

৩। ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের ক্ষেত্রে বিদআত।

বর্তমানে প্রচলিত বিদআত অনেক। শেষ জামানার উপস্থিতি, দীনি জ্ঞানের স্বল্পতা, বিদআত এবং শরীআত বিরোধী কর্মের প্রতি আহ্বানকারীদের আধিক্যতা, কাফিরদের অভ্যাস, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণের প্রবণতার কারণে বিভিন্ন প্রকার বিদআতের প্রকাশ ঘটেছে। সর্বোপরি এক্ষেত্রে -রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী,

لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

অবশ্য অবশ্যই তোমরা পূর্ববর্তীদের (ইয়াহূদী ও নাসারা-খ্রিষ্টানদের) পদে পদে অনুসরণ করবে।[১২১]

১। ঈদে মীলাদুন্নাবী বা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম দিবস উপলক্ষে মীলাদ অনুষ্ঠান করা: এটা খ্রিষ্টানদের ঈসা মাসীহ (আলাইহিস সালাম) এর জন্মোৎসব পালনের সাথে সাদৃশ্য রাখে। ফলে দেখা যায় কিছু জাহিল বা মূর্খ মুসলিম এবং পথভ্রষ্ট আলিম প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসে অথবা অন্য সময়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম দিবস উপলক্ষে মীলাদ মাহফিল করে থাকে। তারা কেউ মসজিদ, বাড়ী বা এ অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত স্থানে এ মীলাদ মাহফিল করে থাকে। এ সকল অনুষ্ঠানে অনেক নেতৃস্থানীয় এবং সাধারণ জনতা উপস্থিত হয়। মূলত খ্রিষ্টানদের ঈসা মাসীহ্ (আলাইহিস সালাম) এর জন্মোৎসব পালনের বিদআতের সাথে সাদৃশ্য রেখেই তারা এমনটি করে থাকে। এসকল অনুষ্ঠান বিদআত তো বটেই, খ্রিষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য সম্পন্ন এবং গর্হিত কাজ ও শিরকের মত অমার্জনীয় পাপ থেকেও মুক্ত নয়। যেমন: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষেত্রে এমন কিছু কাসিদা (কবিতা) গাওয়া হয় যাতে রয়েছে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি, কখনো তা আল্লাহকে বাদ দিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আহ্বান করা, তার নিকটে সাহায্য চাওয়া পর্যন্ত পৌঁছায়। অথচ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.

তোমরা আমাকে নিয়ে ঐরকম বাড়াবাড়ি করিও না যেমনটি খ্রিষ্টানরা ইবনে মারঈয়ামকে (ঈসা (আলাইহিস সালাম) নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি আল্লাহর একজন বান্দা মাত্র, অতএব, তোমরা আমাকে আব্দুল্লাহ্ (আল্লাহর বান্দা) এবং আল্লাহ তা'আলা এর রসূল বলে আখ্যায়িত করবে।[১২২]

অনেক সময় এসকল অনুষ্ঠানে নারী পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ, চরিত্র বিনষ্ট এবং মদ পানের মত ঘটনাও ঘটে। হাদীসে বর্ণিত الإطراء শব্দের অর্থ- প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা, আবার কখনো তারা এ বিশ্বাসও করে যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। তাই

[১২১] সহীহ বুখারী হা/৭৩২০, ইবনে মাজাহ হা/৩৯৯৪।

[১২২] সহীহ বুখারী হা/৩৪৪৫।

দাঁড়িয়ে সম্মান করা হয়। এ সকল অনুষ্ঠানে আরো যে সকল খারাবি হয়: সম্মিলিত গান গাওয়া, ঢোল বাজানো এবং সুফীদের বিভিন্ন বিদআতী যিকির ও কর্মাদি। কখনো তাতে নারী পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ হয় যা ফিৎনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং যিনার মতো অপকর্মও ঘটে। এসকল অনুষ্ঠান উল্লেখিত গর্হিত মারাত্মক অপরাধ সমূহ থেকে মুক্ত হয়ে শুধু একত্রিত হওয়া, আহার গ্রহণ এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম উপলক্ষ্যে আনন্দ প্রকাশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হলেও (যেমনটি তারা বলে থাকে) তা নবাবিষ্কৃত বিদআত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: (দীনের মাঝে) প্রত্যেক নবাবিষ্কৃত বিষয়ই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই গুমরাহী বা ভ্রষ্টতা। এসকল অনুষ্ঠান খারাবি বৃদ্ধি হওয়ার কারণও বটে। এসকল অনুষ্ঠানেও ঐ সকল খারাবি ও কুকর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে যা অনৈসলামিক এবং বিধর্মীদের অনুষ্ঠান সমূহে সংঘটিত হয়। পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি: মীলাদ মাহফিল বিদআত; কেননা কুরআন, সুন্নাহ, সালফে সালেহীনের আমল এবং উত্তম তিন যুগে তার (মীলাদের) অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। চতুর্থ শতাব্দির পরবর্তী সময়ে মীলাদের উৎপত্তি হয়েছে, শিয়াদের ফাতিমী সম্প্রদায় তার প্রথম প্রচলন ঘটায়।

ইমাম আবূ হাফস তাজুদ্দীন আল ফাকিহানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: অতঃপর কিছু সম্মানিত ভাইয়ের পক্ষ থেকে রবিউল আউয়াল মাসকে কেন্দ্র করে যে সকল কর্মাদি, অনুষ্ঠান, মীলাদ হয়ে থাকে সে বিষয়ে আমাকে বার বার প্রশ্ন করা হয়েছে। ইসলামে এর কোন ভিত্তি (আসল) রয়েছে কি? তাদের উদ্দেশ্য হলো আমি যেন এব্যাপারে তাদেরকে স্পষ্টভাবে জবাব (উত্তর) দেই।

উত্তর: আমার জানামতে কুরআন সুন্নাহয় এর কোন ভিত্তি নেই। উম্মতের নির্ভরযোগ্য, অনুস্মরণীয় এবং পূর্ববর্তীগণের সুন্নাতকে মজবুতভাবে ধারণকারী উলামাগণের কেউ এ আমল করেছেন এরও কোন প্রমাণ নেই। বরং তা বিদআত যা বাত্তালুন তথা মিসরের ফাতিমী সম্প্রদায়ের শিয়া লোকেরা আবিষ্কার করেছে। আর কিছু লোক আত্ম প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে একাজ করে যার মাধ্যমে পেটুকদের পেট পূজা করা হয়।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: এমনিভাবে কিছু মানুষ মীলাদের ক্ষেত্রে যা আবিষ্কার করেছে, তা হয়তো খ্রিষ্টানদের ঈসার (আলাইহিস সালাম) জন্মোৎসবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে অথবা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালোবাসা ও সম্মানার্থে হবে। এটাকে তারা নাম দিয়েছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মদিনের ঈদ। অথচ রসূলের জন্ম দিনের ব্যাপারে উলামা এবং ঐতিহাসিকগণ একমত নন। (কোন দিন তাঁর জন্ম হয়েছে)। সালফে সালেহীন (পূর্ববর্তী সৎ ব্যক্তিগণ) তা করেননি।

যদি এতে কোন কল্যাণ থাকত তবে তারা আমাদের পূর্বে অবশ্যই তা পালন করতেন। কেননা তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আমাদের চাইতে বেশি ভালোবাসতেন এবং সম্মান করতেন। কল্যাণকর কাজে তারা আমাদের চাইতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য, অনুসরণ, তার আদেশের বাস্তবায়ন, আন্তরিক ও বাহ্যিকভাবে তার সুন্নাতকে জীবিত করণ, তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার প্রচার এবং এক্ষেত্রে অন্তর, হাত এবং জিহ্বা (বক্তৃতা) দিয়ে জিহাদ করা ইত্যাদির মাধ্যমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভালোবাসতেন এবং সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। এটাই ছিল পূর্ববর্তী মুহাজির, আনসার এবং সঠিকভাবে তাদের পথ অনুসরণকারীদের নিয়ম বা পদ্ধতি।[১২৩] মীলাদ মাহফিলের বিদআতের প্রতিবাদে পূর্বে এবং বর্তমানে অনেক কিতাব ও পুস্তিকা রচিত হয়েছে। মীলাদ অনুষ্ঠান করা বিদআত এবং ঈসায়ীদের জন্মোৎসবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ উপরন্তু তা মানুষকে অন্যান্য জন্মোৎসব পালনের দিকে ধাবিত করে। যেমনঃ ওলী আউলিয়া, মাশায়েখ এবং নেতাদের জন্মোৎসব পালন করা। এতে করে অনেক খারাবি ও অপকর্মের দ্বার উম্মুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে।

২। বিশেষ কোন স্থান বা নিদর্শনাবলি কিংবা মৃত অথবা জীবিত ব্যক্তি বা অনুরূপ কোন কিছুর মাধ্যমে বরকত অর্জন করাঃ বর্তমানে চলমান বিদআতসমূহের মধ্যে রয়েছে, কোন সৃষ্টি জীবের মাধ্যমে বরকত অর্জন করা, আর এটা পৌত্তলিকতারই একটা বিশেষরূপ ও ফাঁদ। যার মাধ্যমে পেট পূজারীরা সরল মনা লোকদের মাল-সম্পদ ভক্ষণ করে। 'তাবাররুক' অর্থ বরকত চাওয়া বা প্রার্থনা করা। অর্থাৎ কোন জিনিসে কল্যাণ স্থায়ী ও বৃদ্ধি হওয়া। আর কল্যাণ স্থায়ী ও বৃদ্ধি হওয়া তার নিকটেই প্রার্থনা করতে হবে যিনি তার মালিক এবং তা দিতে সক্ষম। তিনি হলেন মহা পবিত্র মহান রব্বুল আলামীন। তিনিই বরকত নাযিল ও স্থায়ী করেন। মাখলুক (সৃষ্টিজীব) বরকত দিতে, তার অস্তিত্ব দানে এবং বরকতকে স্থায়ী করতে সক্ষম নয়। অতএব স্থান, স্মৃতি চিহ্ন এবং জীবিত বা মৃত ব্যক্তির মাধ্যমে বরকত অর্জন করা বৈধ নয়-হারাম। কেননা যদি কেউ এ বিশ্বাস করে যে, উক্ত জিনিস বা ব্যক্তি বরকত দান করে তবে তা হবে স্পষ্ট শিরক। অথবা যদি বিশ্বাস করে যে, উক্ত জিনিস বা ব্যক্তির যিয়ারত, স্পর্শ বা মাসাহ্ করা আল্লাহর পক্ষ হতে বরকত অর্জনের কারণ তবে তা শিরকের অন্যতম মাধ্যম। অপরদিকে সাহাবাগণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চুল, থুথু এবং শরীরের

---

[১২৩] ইকতিযা উসসিরাতুল মুস্তাকীম ২/৬১৫-কিঞ্চিত সংক্ষেপিত।

ঘাম দিয়ে বিশেষভাবে যে বরকত অর্জন করতেন তা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথেই নির্দিষ্ট।

সাহাবাগণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘরের বা তার মৃত্যুর পর তার কবরের মাধ্যমে বরকত অর্জন করেননি এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল স্থানে সালাত আদায় করেছেন বা বসেছেন সাহাবাগণ বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে সে সকল স্থানে যাননি। এমনিভাবে কোন ওলী-আওলিয়াগণ যে সকল স্থানে সালাত আদায় করেছেন বা বসেছেন অথবা তাদের বা তাদের কবরের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতেই বরকত অর্জন করা যাবে না। কেননা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এসব জিনিসের মাধ্যমে বরকত অর্জন করা হয়নি, তবে তার যাত বা সত্ত্বার মাধ্যমে বরকত অর্জন করা তার সাথেই নির্দিষ্ট। কারণ, তিনি হলেন সাইয়িদুল মুরসালীন, এ ক্ষেত্রে তার সাথে অন্য কোন মানুষের তুলনা চলে না। সাহাবা বা তাবিঈগণ কোন সৎ ব্যক্তির জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পর তার মাধ্যমে বরকত অর্জন করেননি। যেমন, আবূ বকর, উমার এবং অন্যান্য সম্মানিত সাহাবাগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)। তারা হেরা গুহাতে সালাত আদায় বা সেখানে দুআ করার জন্য যাননি। এমনিভাবে যে তুর পাহাড়ে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আলাইহিস সালাম) এর সাথে কথা বলেছিলেন অথবা অন্য কোন পাহাড় যার ব্যাপারে বলা হয় তাতে কোন নাবী বা অন্য কেউ অবস্থান করেছিলেন এবং যেখানে কোন নাবীর স্মৃতিকে কেন্দ্র করে কোন স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে সাহাবাগণ সে সকল স্থানে যাননি। অপরদিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় যে স্থানে সব সময় সালাত আদায় করতেন সালাফগণের (সাহাবা ও তাবিঈগণের) কেউ সে স্থানটি স্পর্শ করতেন না এবং তাতে চুমুও খেতেন না। এমনি মক্কাতে যেখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করেছেন সেখানেও কেউ চুমু খাননি বা তা স্পর্শ করেননি। যে সকল স্থানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্মানিত দুই পা দিয়ে চলাফেরা করেছেন, যেখানে সালাত আদায় করেছেন তা স্পর্শ করা ও তাতে চুমু খাওয়া যদি তার উম্মাতের জন্য শরীআত সম্মত করা না হয় তবে তিনি ব্যতীত অন্যের সালাত আদায়ের ও ঘুমার স্থান চুমু খাওয়া বা স্পর্শ করা কি করে জায়িয হতে পারে!! অতএব, ইসলামের আলিমগণ স্পষ্টভাবেই জানেন যে, এরূপ কোন জিনিসকে চুমু খাওয়া এবং স্পর্শ বা মাসাহ্ করা রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীআতের কোন অংশই না।[১২৪]

[১২৪] ইকতিযা উসসিরাতিল মুস্তাকীম ২/৭৯৫-৮০২, তাহকীক ড. নাসির আল-আকল।

(বরং তা বিদআত এবং গুনাহের কাজ যা মানুষকে অনেক সময় জাহান্নাম ওয়াজিবকারী ও আমল বিনষ্টকারী শিরকে পতিত করে)।[১২৫]

৩। ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের ক্ষেত্রে বিদআতসমূহ: বর্তমান যুগে ইবাদতের মাঝে যে সকল বিদআত সংযোজীত হয়েছে তা অনেক। ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো "তাওকীফী" তথা ইবাদতের ক্ষেত্রে আমাদেরকে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথার ওপরই নির্ভর করতে হবে। অতএব দলীল ছাড়া কোন কিছুকে শরীআতের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। অর্থাৎ দলীল বিহীন শরীআত মানা যাবে না। আর যে কাজের দলীল নেই তা বিদআত। কেননা - রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদের ইসলামী শরীআত সমর্থন করে না তা পরিত্যাজ্য।[১২৬]

বর্তমানে দলীলবিহীন যে সকল কাজকে ইবাদত মনে করা হচ্ছে তার সংখ্যা অনেক, তার মধ্যে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলো:

১। মুখে উচ্চারণ করে সালাতের নিয়্যাত পাঠ করা: যেমন, নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি এরূপ এরূপ বলা। অর্থাৎ আমি আল্লাহর জন্য বা উদ্দেশ্যে এত রাকআত সালাত আদায়ের নিয়্যাত করছি। এরূপ বলা বিদআত। কেননা তা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

বলুন, তোমরা কি তোমাদের দীন সম্পর্কে আল্লাহকে অবহিত করছ? অথচ আল্লাহ জানেন ভূমণ্ডলে এবং নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। *সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: ১৬।*

[১২৫] ইকতিযা উসসিরাতিল মুস্তাকীম ২/৭৯৫-৮০২, তাহকীক ড. নাসির আল-আকল।
[১২৬] সহীহ মুসলিম ১৭১৮, দারাকুৎনী ৪৫৩৭, মুসনাদে আহমাদ ২৬১৯১।

নিয়্যাতের স্থান অন্তর বা হৃদয়। অতএব তা অন্তরের ইবাদত বা কাজ, জিহ্বা বা মুখে পড়ার বিষয় নয়।

২। সালাতের পর সম্মিলিত যিকির ও সবাই এক সাথে হাত তুলে দুয়া করা: কেননা, সুন্নাত হলো হাদীসে উল্লেখিত সালাতের পরের দুআগুলো প্রত্যেক ব্যক্তি একাকী পড়বেন।

৩। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, দুআর পরে এবং মৃত ব্যক্তিদের জন্য সূরাহ ফাতিহা পাঠ করতে বলা।

৪। মৃত ব্যক্তিদের উপলক্ষ্যে শোক অনুষ্ঠান বা শোক সভা করা, খাবার তৈরী করা, পয়সার বিনিময়ে কুরআন তিলাওয়াত ও তা খতম করা: তাদের ধারণা এটা সমবেদনা জানানোর অন্তর্ভুক্ত। অথবা এটা মৃত ব্যক্তির উপকারে আসবে! আর উল্লেখিত সব ক'টি কাজই বিদআত। সওয়াবের জন্য নয়, বরং গুনাহের কাজ এবং নিজের ওপর এমন বোঝা চাপিয়ে নেয়া শরীআতে যার কোন ভিত্তি নেই। আর আল্লাহ তা'আলাও সে ব্যাপারে কোন দলীল অবতীর্ণ করেননি।

৫। দীনি বিভিন্ন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে মিলাদ অনুষ্ঠান করা: যেমন, ইসরা ও মিরাজ রজনী পালন করা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হিজরত দিবস উপলক্ষ্যে মীলাদ মাহফিল করা। এ দিবস পালন এবং সে দিন মীলাদ মাহফিল করার কোন মূল ভিত্তি শরীআতে নেই।

৬। রজব মাসের আমল: এমনিভাবে নির্দিষ্ট করে যা কিছু করা হয় তা বিদআত। যেমন, রজব মাসে বেশি বেশি নফল সালাত ও সিয়াম আদায় করা। কেননা, অন্য মাস অপেক্ষা রজব মাসের কোন অতিরিক্ত বিশেষত্ব নেই। রজব মাসে সালাত আদায়, সিয়াম পালন এবং আল্লাহর রাস্তায় কোন জন্তু যবেহ্ করা সহ ইত্যাদি কাজে বেশি সওয়াব পাওয়া যায় না।

৭। সুফীদের বিভিন্ন প্রকার যিকির আযকারসমূহ সবই বিদআত ও নবাবিষ্কৃত: কেননা, তাদের মনগড়া যিকিরের শব্দ চয়ন, পঠন-গঠন পদ্ধতি এবং এটার জন্য সময় নির্দিষ্ট করা সবই শরীআত সমর্থিত যিকির আযকারের পরিপন্থি।

৮। বিশেষ করে শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাত্রে জাগা ও কিয়াম করা: সালাত আদায় করা এবং শাবানের ১৫ তারিখে দিনের বেলা সিয়াম পালন করা বিদআত। কেননা, শাবানের পনের তারিখ রাত বা দিনের বিশেষ কোন ফযীলত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সাব্যস্ত নেই।

৯। কবরের ওপর কোন কিছু নির্মাণ করা, কবরকে মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করা: অর্থাৎ কবরস্থানে সালাত আদায় করা, যেমনটি অনেক মাজারে দেখা

যায়। কবরের মাধ্যমে বরকত অর্জন, কবরস্থ মৃত ব্যক্তির মাধ্যমে দুআ করা এবং অনুরূপ অন্যান্য শিরকি উদ্দেশ্যে কবরস্থানে বা কোন পীর-ওলী আওলিয়ার মাজারে যাওয়া।

১০। মহিলাদের কবর যিয়ারত করাঃ কারণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতকারী নারীদের, কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণকারী এবং কবরে বাতিদানকারী লোকদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। উপরোক্ত সব কিছুই বিদআতের অন্তর্ভুক্ত, অনেক সময় তা শিরক পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়।

বিদআতের ভয়াবহতা ও ক্ষতিকারক দিক

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, বিদআত হলো কুফরীর মাধ্যম ও পাতানো ফাঁদ। বিদআত হলো দীনের মাঝে অতিরিক্ত কিছু প্রবেশ করানো যা আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীআত সম্মত করেননি। বিদআত কাবীরাহ (বড়) গুনাহ থেকেও মারাত্মক ও ভয়াবহ। কাবীরা গুনাহ করার চেয়ে বিদআত করাতেই শয়তান বেশি খুশি হয়। কেননা, অবাধ্য বা পাপী ব্যক্তি পাপ করে এবং সে জানে যে, এটা পাপের বা গুনাহের কাজ ফলে সে তা হতে তাওবা করে ফিরে আসে। অপরদিকে বিদআতী ব্যক্তি যখন বিদআত করে তখন তার এ বিশ্বাসই থাকে যে, উক্ত কাজটি দীনের অংশ এবং ইবাদত যার মাধ্যমে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করছে। অতএব সে ঐ বিদআত থেকে তাওবা করে না। বিদআত সুন্নাতের অপমৃত্যু ঘটায় এবং বিদআতীর নিকটে সুন্নাতী কর্মকাণ্ড ও আহলুস সুন্নাহকে অপছন্দনীয় ও ঘৃণার পাত্রে পরিণত করে। বিদআত মানুষকে আল্লাহ তা'আলা হতে দুরে সরিয়ে দেয়। আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তি আবশ্যক করে এবং অন্তরের বক্রতা ও ফাসাদ বা অনিষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمۡۚ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ﴾

অতঃপর তারা যখন বক্রপথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহও তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ ফাসিক (পাপাচারী) সম্প্রদায় কে পথ প্রদর্শন করেন না। *সূরা আস্-সফ্‌ফ ৬১: ৫।*

বিদআতীরা উযূ ও সালাত আদায় করা সত্ত্বেও হাওযে কাওছারের পানি পান করা হতে বঞ্চিত হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে হাওযে কাওছারের নিকট থেকে তাড়িয়ে দিবেন। হাদীসে এসেছেঃ

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَسَمِعَنِي النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتَ مِنْ سَهْلٍ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَزِيدُ فِيهَا فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي.

সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের আগেই হাউযে কাওছারের নিকটে উপস্থিত থাকব। যারা আমার হাউযে কাওছারের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তারা সেখান থেকে পানি পান করবে। আর যে ব্যক্তি সেখান থেকে একবার পানি পান করবে সে আর কখনো পিপাসিত হবে না। এরপর আমার নিকটে কিছু কওম আসবে যাদেরকে আমি চিনতে পারব, তারাও আমাকে চিনতে পারবে! অতঃপর তাদের এবং আমার মাঝে ফেরেশতাগণ বাধার সৃষ্টি করবেন। আবূ হাযিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, নুমান ইবনে আবি আইয়্যাশ (রাহিমাহুল্লাহ) আমাকে এমন হাদীস বর্ণনা করতে শুনে বললেন: আপনি কি সাহ্ল ইবনে সাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এভাবেই শুনেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তখন বললেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে এ হাদীসে একটু অতিরিক্ত সহকারে বর্ণনা করতে শুনেছি। সেখানে রয়েছে: ফেরেশতাগণ যখন বাধার সৃষ্টি করবেন, তখন আমি বলব: আপনারা এদেরকে বাধা দিচ্ছেন কেন? এরা তো আমার উম্মাত! তখন বলা হবে: আপনি জানেন না, এরা আপনার পরে কি কি বিদআত বা ধর্মের মাঝে নতুন আমল সৃষ্টি করেছিল!! রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন আমি বলব, আমার পরে যারা আমার দীনে পরিবর্তন করেছিল তারা এখান থেকে দূর হয়ে যাও![১২৭]

বিদআতের আরো ভয়াবহ ও ক্ষতিকারক দিক রয়েছে: যেমন-

ক) তারা ইসলামের সঠিক পথ থেকে বহু দূরে সরে যায়।

খ) বিদআতীর আমল গ্রহণ করা হয় না বরং তা প্রত্যাখ্যাত বা পরিত্যাজ্য হয়।[১২৮]

গ) বিদআতীরা অন্যের পাপের ভাগী হয়ে থাকে।[১২৯]

---

[১২৭] সহীহ বুখারী হা/৬৫৮৩-৬৫৮৪।

[১২৮] সহীহ বুখারী হা/২৬৯৭ ও মুসলিম হা/১৭১৮।

ঘ) বিদআতীদের বিদআতের জন্য সুন্নাত উঠে যায়।[১৩০]

ঙ) বিদআতীদের দুআ আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না।[১৩১]

চ) বিদআতীকে যারা আশ্রয় দেয় তাদের ওপরও আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়।[১৩২]

ছ) বিদআতীরা মূলত আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূলকে কষ্ট দেয়। তাইতো আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেন এবং তাদের জন্য কঠিন শাস্তিরও ব্যবস্থা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا﴾

নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তার রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশাপ বর্ষণ করেন। আর তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। *সূরা আল আহযাব ৩৩: ৫৭।*

জ) বিদআতীরা সুন্নাতের ওপর আমলকারী অনেক ব্যক্তিকে ঘৃণার মাধ্যমে মূলত সুন্নাতকেই ঘৃণা করে। ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও শারীরিকভাবেও তারা সহীহ সুন্নাতের ওপর আমলকারীদেরকে কষ্ট দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। অথচ সুন্নাত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা স্পষ্ট কুফরী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَـٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَـٰنِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ﴾

আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তার হুকুম আহ্‌কামের সাথে এবং তার রসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছিলে? ছলনা (ওযর) পেশ কর না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর!। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দিব। কারণ, তারা ছিল গুনাহগার। *সূরা আত-তাওবা ৯: ৬৫-৬৬।*

---

[১২৯] সহীহ মুসলিম হা/১০১৭, ইবনে মাজাহ হা/২০৩।

[১৩০] সহীহ: সুনানে দারিমী হা/৯৯, মিশকাত হা/১৮৮।

[১৩১] সিলসিলা সহীহা হা/১৬২০।

[১৩২] সহীহ মুসলিম হা/১৯৭৮।

ঝ) অপর দিকে মুমিনদেরকে কষ্ট দিয়ে তারা অপবাদদাতা ও পাপের ভাগী হয়। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ بِغَيۡرِ مَا ٱكۡتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَٰنًا وَإِثۡمًا مُّبِينًا﴾

বিনা কারণে বা অপরাধে যারা মুমিনদেরকে কষ্ট দেয় মূলত তারা অপবাদদাতা ও বড় গুনাহগার। *সূরা আল-আহযাব ৩৩: ৫৮।*

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বিদআতের কঠিন ভয়াহতার চিত্র স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। তাই সাধু সাবধান! এই ভয়াবহ ও ক্ষতিকর বিষয়গুলোতে যেন আমরা পতিত না হই। সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে বিদআত পরিত্যাগ করে সুন্নাতের ওপর আমল করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বিদআত ও বিদআতী থেকে হিফাযত করুন, আমীন।

বিদআতীদের সাথে কেমন ব্যবহার করা উচিত

বিদআতীর সাথে দেখা করতে যাওয়া এবং তার সাথে উঠা বসা করা হারাম। তবে তাকে নছীহত (কল্যাণ কামনার উদ্দেশ্যে উপদেশ) এবং তার বিদআতের প্রতিবাদ করার জন্য যাওয়া যেতে পারে। কেননা, যে ব্যক্তি তার সাথে উঠা বসা করবে তার উপরে বিদআতীর খারাপ প্রভাবই পড়বে এবং অন্যের নিকটে তার শত্রুতা ছড়িয়ে পড়বে। বিদআতী ও তাদের খারাবি থেকে বাঁচা ও সতর্ক থাকা ওয়াজিব। আর এটা তখন যখন বিদআতীদেরকে রুখে দেয়া এবং তাদেরকে বিদআতী কর্মকাণ্ড চর্চা থেকে বাধা দেয়ার শক্তি না থাকবে। পক্ষান্তরে, যদি শক্তি থাকে তবে মুসলিম উলামা এবং তাদের আমীরের ওপর ওয়াজিব হলো বিদআতকে রুখে দেয়া। বিদআতীদেরকে গ্রেফতার করা এবং তাদের খারাবিকে নিবৃত্ত করা। কেননা, ইসলামের ওপর তাদের ভয়াবহতা বড় কঠিন। অতঃপর এটা জানাও ওয়াজিব যে, কুফরী রাষ্ট্রগুলো বিদআতীদেরকে তাদের বিদআতের প্রসারে উৎসাহিত ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাদেরকে সহযোগিতা করে। কেননা, এতে ইসলামকে ধ্বংস এবং কলুষিত করার যাবতীয় ব্যবস্থা রয়েছে। আল্লাহর নিকটে আমরা এ প্রার্থনাই করি তিনি যেন তার দীনকে সহযোগিতা করেন, তার কালিমাকে (একত্বকে) উঁচু করেন। তার শত্রুদেরকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিবার ও সাথীবর্গের ওপর রহমত ও শান্তি নাযিল করুন। আল্লাহুম্মা আমীন।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত কিতাবসমূহ

১. কিতাবুল ঈমান- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২. শারহুস সুন্নাহ-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

৩. কিতাবুত তাওহীদ- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৪. কিতাবুত তাওহীদ
- ড. সালিহ্ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৫. আকীদাতুত তাওহীদ
-ড. সালিহ্ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

৬. আল ইরশাদ- সহীহ্ আকীদার দিশারী (ঈমানের মূলনীতির ব্যাখ্যা)
- ড. সালিহ্ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪৫০ টাকা]

৭. আল ওয়াসীয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

৮. আল আকীদা আল ওয়াসিতীয়া
- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৮০ টাকা]

৯. শারহুল আকীদা আল ওয়াসিতীয়া
-ড. সালিহ্ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১০. শারহু মাসাঈলিল জাহিলিয়্যাহ
- ড. সালিহ্ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১১. শারহুল আকীদা আত-তহাবীয়া প্রথম খণ্ড
-ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০০ টাকা]

১২. শারহুল আকীদা আত-তহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড
-ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০০ টাকা]

১৩. নবী-রসূলগণের দাওয়াতের মূলনীতি
- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৪. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৫. কিতাবুল ইলম (জ্ঞান)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৬. কিয়ামতের সহীহ আলামত- শাইখ ইসাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৭. ফিকহুল খিলাফাত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

১৮. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়‘আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

১৯. ইসলামী রাজনীতি বিষয়ক ফতোয়া

-শাইখ মুকবিল ইবনে হাদী আল ওয়াদিয়ী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২০. ফিকহের মূলনীতি (আল উসূল মিন ইলমিল উসূল)

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২১. হাদীস আকীদা ও ফিকহের স্বতন্ত্র দলীল

- মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ [নির্ধারিত মূল্য: ১৫০ টাকা]

২২. মুখতাসার কিতাবুত তাওহীদ

-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুযাইমাহ [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

২৩. মানহাজ-কর্মপদ্ধতি

- ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

২৪. মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত আকীদার নিরসন

- ড. আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

২৫. ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৬. ইজতিহাদ ও তাকলীদ

- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২৭. ফায়সালা ও তাকদীরের প্রতি ঈমান

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-হামাদ [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

২৮. কিতাবুল ফারায়েয-উত্তরাধিকার আইন

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২৯. উমদাতুল আহকাম

- ইমাম হাফেয আব্দুল গনী আল-মাকদেসী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

৩০. তাওযীহু উসূলিল ফিকহ্ আলা মানাহাজি আহলিল হাদীস

-যাকারীয়া ইবনে গুলাম কাদীর [নির্ধারিত মূল্য: ৩৫০ টাকা]

৩১. আন নাবযাতুল কাফীয়া ফী আহকামি উসূলিদ দীন-দীনের মূলনীতি

- ইমাম ইবনে হাযম আন্দালুসী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩২. আদ-দুরারুল বাহীয়াহ ফিল মাসাঈলিল ফিকহিয়াহ

- মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

৩৩. নতুন চাঁদের মাসআলা

-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩৪. ইমাম নব্বীর চল্লিশ হাদীসের ব্যাখ্যা

-ইমাম ইবনে দাকীক ঈদ [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩৫. তাহসীলুল মামূল মিন ইলমিল উসূল

-আল্লামা সিদ্দিক হাসান খাঁন [নির্ধারিত মূল্য: ১৫০ টাকা]

৩৬. মুখতাসার ফিক্বহুস সুন্নাহ-আল লুবাব ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব

- মুহাম্মাদ সুবহী ইবনে হাসান হাল্লাক্ব [নির্ধারিত মূল্য : ৯০০ টাকা]

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত দাওয়াতী রিসালাসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদার সংক্ষিপ্ত মূলনীতি

-ড. নাসের ইবনে আব্দুল করীম আল-আকল [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৩. ইসলামী আকীদা বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৪. আকীদা আত-তাওহীদ বিষয়ে ১০০ প্রশ্নোত্তর

-আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আশ-শাআলান [নির্ধারিত মূল্য: ৪০ টাকা]

৫. আহলুল হাদীসদের আকীদা-আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইসমাঈল আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা]

৬. উসূলুস সুন্নাহ-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৭. লুমআতুল ইতিকদ-আকীদার ঝলক

-ইবনে কুদামা আল-মাকদেসী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

৮. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা

- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৯. আল আকীদা আত-তহাবীয়া

- ইমাম আবূ জাফর আহমাদ আত-তহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১০. আল ওয়ালা ওয়াল বারা [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১১. আমাদের দাওয়াত, আমাদের আকীদা ও ফিতনাহ হতে মুক্তির উপায়

-শাইখ মুকবিল ইবনে হাদী আল ওয়াদিয়ী [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা]

১২. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানকীতী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

১৩. ইসলামে মানবাধিকার

- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

১৪. কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা

-সংকলনে ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১৫. হাদীসের মূলনীতি - মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আসারী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১৬. এক নজরে সালাত-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

১৭. একশত কবীরা গুনাহ

- ড. সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ আস-সাইয়্যাহ [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

১৮. যাকাতুল ফিতর

- মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

১৯. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবিয়া-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ
-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

২০. নতুন চাঁদের বিধান- শায়েখ আদনান ইবনে মুহাম্মাদ আল আরঊর
[নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

২১. সিয়াম পালনকারীর হিজামার বিধান
শাইখ উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী রহিমাহুল্লাহ। [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

২২. বিদআতের মূলনীতি ও উম্মাহর প্রতি তার কুপ্রভাব- আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু নাসির আল-ফাকীহী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা]